দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুনো হাঁসের উড়াল

অমর মিত্র

গত সন্ধেয় যা ঘটে গেছে তা নিয়ে বিপুল নিজেই নিজের যুক্তির কাছে হেরে যাচ্ছে। ঘোর কাটছে না এখনও। এমন হতে পারে, হয় নাকি? অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে গেল প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ নামের দুই ব্যক্তি। হ্যাঁ, কুয়াশার ভিতর তারা মিলিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে এখানে এসেই আলাপ হয়েছিল। বলতে গেলে তারা যেন অপেক্ষা করছিল তাদেরই জন্য। এবং একটা কিছুর জন্য। তারা নাকি শুনেছিল কিছু একটা ঘটবে। নেত্রকোনা জেলার এই সুসঙ্গ দুর্গাপুরে কেউ বা কেউ কেউ আসছেন। তারপর বড় কিছু ঘটে যাবে। তারা এসেছিল সেই খবর পেয়ে। তারা নাকি এই রকম খবর কিছুটা শুনে কিছুটা না শুনেও কোথাও কোথাও যায়, সেখানে যা ঘটতে পারে তার প্রত্যক্ষদর্শী হতে। তাদের গ্রাম গারো পাহাড়ের কোলে। তারা বলেছিল, তাদের কাজ ঘুরে ঘুরে সব কিছুর সাক্ষী থাকা। যা ঘটবে তা তাদের সামনে ঘটুক, এই জন্যই তারা নাকি আগেভাগে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেছিল সুসঙ্গ দুর্গাপুরে। তারা দেখতে ভালোবাসে। দেখে সেই গল্প নিয়ে ফেরে নিজেদের গ্রামের মানুষের কাছে। তারা গ্রাম থেকে কোথাও গেলে গ্রামের মানুষ অপেক্ষা করে, ঝুলিতে কী ভরে নিয়ে এল প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ দুই মামাতো-পিসতুতো ভাই। অদ্ভুত! এই কাহিনী সাবেক ময়মনসিংহ জেলার। এখন তা নেত্রকোনা। চারদিন আগে বিপুল সোম এবং অতীন সরকার যখন সিএনজি— জালে ঢাকা অটো নিয়ে সোমেশ্বরী নদীর ধারে সুসঙ্গ দুর্গাপুরে এসে নামে, সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধ দুই ভাই তাদের স্বাগত জানিয়েছিল কুয়াশা আর অস্ফুট দিনের আলোর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে। তারা দাঁড়িয়েছিল রাজাদের চার শরিকের এক শরিকের প্রায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে আসা বাড়ির সামনে, আসুন স্যার আসুন, যা শুনেছি ঠিক শুনেছি তাহলে, কদিন ধরে ভাবতিছি তাহলে কি ভুল শুনলাম, এমনি এলাম দুগ্গাপুর, সত্যি সত্যি কেউ আসবে না, অতীন স্যার এয়েছেন, বুঝা গেল তাঁরই তা'লে আসার কথা।

তোমরা? জিজ্ঞেস করেছিলেন অতীন।

আমরা প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ। আমরা আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করতিছি স্যার, যা ভেবেছি ঠিক তাই।

অবাক হয়েছিল বিপুল। বিচিত্র দেশে এসেছে যেন। তারা দু'জন তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিল এখানে। অপেক্ষার কারণও বিচিত্র নিশ্চয়। অতীনকে তারা চেনে। অতীন অধ্যাপনার সূত্রে এই অঞ্চলে অনেকের পরিচিত। আবার তাঁর দাদা নীতিন সরকার বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় এক মুক্তিযোদ্ধা এবং শিক্ষাবিদ। তাঁকে কে না চেনে? নীতিনের বই আছে অনেক। পাকিস্তান ভাঙার যে ইতিবৃত্ত লিখেছেন নীতিন তার ভিতরে বাংলাদেশ জন্মের অকথিত ইতিহাস কম নেই। আর আশ্চর্যের কথা হল অতীনের কাছে আছে এক অজ্ঞাতনামার রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপি। হ্যাঁ, সেই পাণ্ডুলিপির কথা পরে বলছি।

অতীন সেই দুজন, প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধকে চিনতে পারেননি। বলেছিলেন, দেখেননি কোনওদিন। সেই তারা প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ দু'জন একই উচ্চতার, একই রকম প্রায়। কিন্তু তফাতও আছে। একজন কৃষ্ণকায়, অন্যজন ফর্সা বলা যায়। গৌরবর্ণ। একজনের চোখের মণি কালো, অন্যজনের তা সবুজাভ বাদামি, মার্জারের মতো। সেই কটা চক্ষু হল প্রবুদ্ধ। তারা অতীনদের পিছু পিছু ঘুরছিল। তারা যদি বহেরাতলী গ্রামে যায়, ওরা ঠিক খবর পেয়ে হাজির। তারা যদি সুসঙ্গ দুর্গাপুরের হাটে যায়, ওরা যাবে। ছায়ার মতো ছুঁয়ে থাকবে। দুজনের দুটি সাইকেল ছিল। আর ওদের আশ্রয়ও ছিল সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর। প্রাক্তন রাজ-পরিবারের চার শরিকের এক শরিকের সেই বাড়িতে। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজার তিন শরিক কবে চলে গেছে ইন্ডিয়ায়, দুই ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে সাপখোপের বাসা হয়ে, আর একটিতে মনুষ্য বাস করে। প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ গোপালের ডাকেও যায়নি তার বাড়ি থাকতে। হ্যাঁ, গোপাল দাস ডেকেছিল। সাপখোপের ভিতরে থাকবা কেন, মোর বাসায় এসো।

রাজাদের বড় শরিক এক সিংহমশাই গোপালের বাবা শ্রীমন্তর হাতে রেখে গিয়েছিল সব। শ্রীমন্তর পর গোপাল। জমি-জমা রাখতে পারেনি, কিন্তু বাড়িটি রক্ষা করেছে। নিজের জন্যই রক্ষা করা ধ্বংসস্তূপের একাংশ। রাজপরিবারের কেউ আর আসেন না। আসবেনও না। সেই বাড়িতে থাকে গোপাল দাস তার দুই কন্যাকে নিয়ে। গোপালের বয়স বছর পঞ্চাশ কি তার চেয়ে বেশি। স্ত্রী গত হয়েছেন বছর আট। তখন দুই কন্যা রুমি-ঝুমি দশ-এগারো। সেই রুমি আর ঝুমি এখন সতেরো আর আঠেরো। পিঠোপিঠি দুই বোন। বেড়া বিনুনি করে চুল বাঁধে। আবার বুকের দুই পাশে লম্বা বিনুনি ঝুলিয়ে ঘোরে। সেই বিনুনির গোড়ায় লাল ফিতের ফুল ঝুলিয়ে রাখে। হাসি হাসি মুখ। এখন গোপাল দাস হন্তদন্ত হয়ে হাজির তাদের জেলা পরিষদের বাংলোয়। প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ কোথায় স্যার?

কেন বলুন দেখি? বিপুল জিজ্ঞেস করল।

স্যার, ওরা গত রাতে পিঠে খেতে যায়নি যে। বিপন্ন মুখে বলে গোপাল।

কেন যাওয়ার কথা ছিল? অতীন বললেন।

ইয়েস স্যার, নেমন্তন্ন করেছিলাম পিঠা খাওয়ার, বলল যাবে, যায় নাই।

যেখেনে থাকে সেখেনে গিয়েছিলেন?

নাই স্যার, তারা কেউ নাই, বন-জঙ্গল, সাপের খোলস।

তাহলে চলে গেছে হয়তো। অতীন বললেন।

এ কী র'ম হল, কত মন দিয়া পিঠা করল দুই বুন দুইজনের জন্য, গোপাল বলল, ওরাই পিঠা খেতে চেয়েছিল মোর নিকট।

না খেয়ে যাবে না, আসবে ফিরে, বললেন অতীন।

এই জমকা শীতে তারা থাকল কোথায় রাতে, ওই বাসায় অনেক রাতি আমি গিইছিলাম, ছিল না। উদ্বিগ্ন গলায় বলল গোপাল দাস।

আছে কোথাও, বললেন অতীন।

আমার স্যার সব কুয়াশা কুয়াশা লাগতেছে, কোথায় আছে কেডা বলবে।

বিপুল অবাক হয়ে এই কথোপকথন শুনছিল। কুয়াশার ভিতরেই তো যা হবার তাই হয়েছে। এখনও অবিশ্বাস্য লাগছে। কী থেকে কী হয়ে গেল গত সন্ধ্যায়।

আপনার মেয়েরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন অতীন।

আঁজ্ঞে বাসায়, বলল গোপাল। প্যান্ট, শার্ট, মহিষারঙের মোটা চাদর, মাথায় মাঙ্কি টুপি। শীত আজ খুব।

ওরা ভবঘুরে, চলে গেছে, আবার ফিরেও আসবে ঠিক, অতীন বললেন।

কবে আসবে বলেন? গোপাল জিজ্ঞেস করে।

কবে আসবে সে তো ওরাও জানে না, বললেন অতীন। কিছু একটা ঘটার আগে আসে, ঘটলে চলে যায়।

গোপাল দাস বলে, রুমি-ঝুমি তাই কইছিল, সে নাকি তাই কইছে তাদের নিকট, কিন্তু কবে কখন বলল তা আমি জানি না, মেয়েদের সাথে নাকি দেখা হতো, কিন্তু আমি জানি না, আচ্ছা স্যার, কিছু কি ঘটেছে, কোনও ঘটনা, দুর্ঘটনা?

অতীন বললেন, বুঝতে পারছি না, আমরা ঠিক জানি না, ঘটলেও ঘটে থাকতেও পারে।

জঙ্গি ধরা পড়েছে? উদ্বিগ্ন গোপাল জিজ্ঞেস করে, সন্ত্রাসী?

কেন, কে বলল? অতীন জিজ্ঞেস করে বললেন, জঙ্গির কথা উঠল কেন?

গোপাল বলল, জঙ্গির ঘটনা লুক্কায়িত থাকে স্যার, পুলিস প্রকাশ করে না, তবে ওরা জানতে পারে, মানে সুবুদ্ধ আর প্রবুদ্ধ, আগের সনে তাই হইছিল, ওই খবর হবে তা নাকি তারা জানত, আগের সনে তাই-ই এসেছিল, খবর সত্যি হলে, মুখে নিয়ে ফিরে গেল।

খবরিয়া, ওরা কি নিউজম্যান? জিজ্ঞেস করলেন অতীন, জার্নালিস্ট?

সেইডা জানা নেই, খবরিয়া হলে পেপার থাকে, যেমন ইমতিয়াজ আলি, চন্দ্রকুমার খবরিয়া, তিনি শুধু খবর খুঁজে বেড়ায় আর তাঁর পেপারে ছাপায়, নেত্রকোনা টাইমস। বলল গোপাল।

তাকে জঙ্গির খবর দিয়েছিলেন? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

কদিন বাদে সে এখেনে আসতে বলেছিলাম স্যার, তো চন্দ্রকুমার থানায় গেল, উপজিলা অফিসারের কাছে গেল, কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারল না, প্রমাণ না থাকলে তো খবর ছাপা যায় না। কথা বলতে বলতে গোপাল বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

বিপুল অবাক হয়ে এই কথোপকথন শুনছিল। সে কোন দেশে এসেছে? তার পিতৃপুরুষের দেশ এমন বিচিত্র, এমন অলৌকিক!

এ হল গারো পাহাড়ের দেশ। ওই দেখা যায় গারো পাহাড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা তো নয়, পাহাড়ের পর পাহাড়। উত্তরে ভেসেছে পাহাড়, পুবে ভেসেছে পাহাড়, মেঘালয়ের পাহাড়, গারো পাহাড়। সোমেশ্বরী নদীর সেতুর উপর দাঁড়িয়ে পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়। কাছেই তো। ওই পাহাড় থেকে নেমেছিল যে সিমসাং নদী সমতলে তার নাম হয়েছে সোমেশ্বরী। সোমেশ্বরী নদী আর পাহাড়তলি, সুসঙ্গ দুর্গাপুর এখন অন্যদেশ। বাংলাদেশ। কিন্তু পাহাড়ে আর বনের ভিতরে প্রবেশ করলে সীমান্ত আর সীমান্তে থাকে না। চলমান অরণ্য, সঞ্চরণশীল পাহাড়, খরস্রোতা নদী আর উড্ডীয়মান পক্ষিকুলের কোনও সীমান্ত নেই। গারো পাহাড়ের কথা যা শুনেছি তা বলি। শুনেছি, বন-পাহাড়ি পথে প্রথমে ছমাস হাঁটতেই হবে উদ্দীষ্ট কোথাও, নিকট অথবা দূরে পৌঁছতে হলে। কেন হাঁটতে হবে, না, বনও যে হাঁটে মনিষ্যির সঙ্গে। পাহাড়ও যে হাঁটে মনিষ্যির সঙ্গে। হাঁটে কিংবা সরে যেতে থাকে। অবিরাম হেঁটে যেতেই হবে বনপথে। বনের গহিনে প্রবেশ করে পুবের পথে হেঁটে গেলে হাওর-বাওর, জাদুকাটা নদী, আর উত্তরে ছ'মাস হেঁটে গেলে হিমানি পর্বত। একমাত্র সেই পর্বতই স্থির। সেখান থেকেই অনড় স্তব্ধতার শুরু। হিমানি পর্বত নৈঃশব্দ্যের পর্বত। শোনা যায় হিমানি পর্বত পেরিয়ে আরও উত্তরে বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দুর। আশমানে চাঁদ সূর্য নেই সেখানে। আঁধারে আঁধারে ঘেরা, বাঘ-ভালুকের বাস সেথায়, মনুষ্য বিরল। শীতের সময় গারো পাহাড়ের দেশে হিমানি পর্বত থেকে সঞ্চরণশীল কুয়াশা ভেসে আসে বনের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে, পায়েচলা পথ ধরে, আন্দাজে আন্দাজে। সেই কুয়াশার সঙ্গে হাঁটে গাছ ও পাহাড়, পাহাড় ও মনিষ্যি। কুয়াশা দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়, প্রলম্বিত হয়। পথ আর বন, বন আর পাহাড় ছেয়ে দিয়ে নেমে আসে পাহাড়তলিতে। তারপর গঞ্জে-গ্রামে, খেতে খামারে, নদীর উপর শুয়ে থাকে দিনের পর দিন। এক একদিন রোদই ওঠে না প্রায়, কুয়াশা যেন নড়তেই চায় না। সূর্যাস্তের আগে কুয়াশার ভিতর থেকে মুখ বাড়ায় গাছ-গাছালি, বাড়ি ঘরদোর, মানুষজন। সবই যেন ধূসর হয়ে আসা, রং মুছে যাওয়া প্রাচীন এক তৈলচিত্রের মতো। সব দিন নয়, এক এক দিন এমন হয়। এমন হয়েছিল একবার। বলছিলেন অতীন সরকার, এমন হয়েছিল মশায়, সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়, খান সেনাদের ভয়ে নেত্রকোনা থেকে আমরা চলে এসেছিলাম এই সুসঙ্গ দুর্গাপুর। উদ্দেশ্য এখান থেকে বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া, মেঘালয় রাজ্য, বাঘমারা জেলায় ঢুকে যাব। নভেম্বরের শেষ, মুক্তিযুদ্ধের সময়।

কলকাতার বিপুল সোম এসেছে তার পিতৃপুরুষের দেশ সুসঙ্গ দুর্গাপুর। সাবেক ময়মনসিংহ জেলা, এখন জেলা নেত্রকোনা। মধ্য জানুয়ারির শীত একেবারে পাহাড়ের মতো বসে গেছে গারো পাহাড়ের কোলে। সদ্য ষাট পার হওয়া অতীন সরকারের বাড়ি নেত্রকোনা। এই এখানে তিনি বিপুলের গাইড বলা যায়। একা এই অজানা জায়গায় এসে বিপুল করবে কী? অতীন অধ্যাপনা করতেন। অবসরের পর ময়মনসিংহ গীতিকার বাইরে যা পড়ে আছে সাবেক ময়মনসিংহ জেলায় সেই সব কথা লিপিবদ্ধ করছেন। তাঁর ভাষায় আপডেট করছেন অজ্ঞাতনামার লেখা পাণ্ডুলিপি। তাঁর কাছে সেই পাণ্ডুলিপি এসে পৌঁছেছে। সেই পাণ্ডুলিপিতেই যোগ করছেন যা তার ভিতরে নেই, তা। যে প্রেম নেই গীতিকায়, তা। যে বিরহ নেই গীতিকায়, তা। যে যুদ্ধের কথা নেই গীতিকায় তাও যোগ করছেন অতীন। পাণ্ডুলিপি কে প্রস্তুত করেছিল তা জানেন না অতীন। তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না, এমনই এক কুয়াশাভরা দিনে কেউ একজন দিয়ে গেছে তাঁর বাড়িতে। স্যারকে দেবেন।

কতদিন হবে? বিপুল জিজ্ঞেস করেছিল।

বছর গড়িয়ে গেল প্রায়, মনে হয় অঘ্রান মাস হবে, নভেম্বরের শেষে, আমি একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ময়মনসিংহ। অতীন বলেছেন।

কে দিয়ে গেল, আপনার পরিচিত কেউ?

মাথা নাড়েন অতীন, কে তা বলতে পারব না।

কে তা জানেন না, পাণ্ডুলিপিতে কোনও নাম নেই? বিপুল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

না নেই। বললেন অতীন।

কেমন চেহারা তা শুনেও বোঝেননি কে হতে পারে? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

অতীন হাসলেন, আমি তখন ময়মনসিংহ শহরে, স্ত্রী জ্যোৎস্না বললেন, কুয়াশার ভিতরে তাকে দেখা যাচ্ছিল না, একটা ভারী জ্যাকেট ছিল গায়ে, ধূসর রঙের, জ্যাকেটের হুড মাথায় তোলা, তাই মুখ অস্পষ্ট, লম্বা মানুষ, খেরোয় বাঁধানো খাতা দিয়ে মিলিয়ে গেল কুয়াশার ভিতর।

আশ্চর্য! বিপুল বিস্ময় প্রকাশ করে, কথা হয়নি বউদির সঙ্গে?

না হয়নি। বললেন অতীন, বলেছিল, স্যারকে দেবেন, উনি জানেন।

খারাপ কিছুও তো হতে পারত, বিপুল বলল, অমন দিয়ে গেল, নিয়ে নিলেন জ্যোৎস্না বউদি! বোমা বারুদ, বিস্ফোরক হতে পারত, এই রকম কত কথা তো শোনা যায়।

না, খাতা তো, তেমন কিছু হলে জ্যোৎস্না নিত না। বললেন অতীন।

বিপুল চুপ করে থাকে। তার মনে হতে থাকে অতীন কিছু গোপন করে যাচ্ছেন। অজ্ঞাতনামা কেউ লিখেছে তা হয়তো সত্য নয়। হয়তো অতীনই লিখছেন সবটা। লাজুক মানুষ। ভাবছেন কী হয়েছে ঠিক নেই, কী দরকার নিজের নাম প্রকাশ করা। হয়তো তিনি আপডেটই করে যাবেন পাণ্ডুলিপি। শেষ হবে না লেখা। তারপর বাক্সবন্দি করে রেখে যাবেন? যেমন করেছিলেন কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশ। নাকি কথাটা সত্যি? আর একজন কেউ লিখেছে। পরের অংশ তার পক্ষে লেখা সম্ভব নয় জেনে অতীনের কাছে দিয়ে গেছে সংশোধন করতে? অজ্ঞাতনামার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছেন অতীন। অথবা তার ভিতরের শূন্যতাগুলি ভরাট করছেন। আবার সে আসবে একদিন তার পাণ্ডুলিপি ফেরত নিতে। তবু বিপুল জিজ্ঞেস করেছে সন্দেহভরে, 'না কি আপনিই লিখছেন নতুন কাহিনী, সবটাই আপনার!' কথা অসম্পূর্ণ রাখে বিপুল।

নিশ্চুপ অপেক্ষা করে কী বলবেন অতীন সরকার। অতীন সব খুলে না বললে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

॥ দুই ॥

নেত্রকোনা জেলার সাবেক সিমসাং নদী, এখন সোমেশ্বরী নদীর উপকূলে যা কিছু ঘটে তা যেন আর কোথাও ঘটে না। এই যে প্রলম্বিত কুয়াশার দিন, এর ভিতরে এখানে যা ঘটে যাচ্ছে, তা যেন ঘটবার কথাই ছিল। এবং তা আগাম জেনে বসে থাকে কেউ কেউ, যেমন সুবুদ্ধ, প্রবুদ্ধ। সবই যেন শীতের কুয়াশার ভিতর থেকে আবছা মুখ দেখানো। বিপুল এমন শীতের কথা শোনেনি মায়ের কাছে, বাবার কাছে। হয়তো বলা প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা, তাই শোনেনি। সে ভাবছিল আসলে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ কারা? ওরা নিজেরাই কি জঙ্গি? সন্ত্রাসী? কিছু ঘটাতে এসেছিল? না ঘটিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে? মনে হয় না।

এইডা তাদের ঠিক হয় নাই, না কয়ে চলি গেছে, রুমি ঝুমির চোখে এখন জল। বলল গোপাল দাস। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলোয়ে দিইছে, পিঠা না খাওয়া তাদের অপমান স্যার।

আহা! অস্ফুট গলায় সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন অতীন সরকার, জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আত্মীয়, নাকি এমনি চেনা লোক ওরা?

তা বলা যাবে না, আবার যাবেও, চিনা তো বটেই, গারো পাহাড়ের দিকে একটা গেরাম আছে, আশুথতলী, সেখেনে ওদের ভিটা। গোপাল বলল, চিনা হইছে এখেনে।

সেখেনে ঘর তো এখেনে চেনা হল কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁজ্ঞা তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, তাই চিনা। গোপালের মুখ যেন স্বচ্ছ জলে ধোয়া, বলল, চিনা হয়ে যায় স্যার, আপনার সঙ্গে তো আলাপ ছিলনি, হয়ে গেল, আর উনি তো ইন্ডিয়ার, আমি ইন্ডিয়া যাইনি কখনও, যাব বলেও মনে করিনি কোনওদিন, কিন্তু চিনা তো হয়ে গেল।

না না, কী করে এত চেনা হল যে পিঠার নেমন্তন্ন পায়, মেয়েরা রাত জেগে পিঠা বানায়? জিজ্ঞেস করলেন অতীন।

ভুলি গিছি স্যার, সব কী মনে থাকে? গোপাল বলে, মা মরা মেয়েদুটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, আপনারা চলেন।

আমরা গিয়ে কী করব? না পেরে অবাক বিপুল জিজ্ঞেস করে।

আপনারা স্যার চলেন মোর বাসায়, মেয়ে দুটারে বুঝাবেন, ওরা দুরাত জেগে পিঠা বানালো পরশু, তরশু, চিতল পিঠা, নারকেল পুলি, চন্দ্রপুলি, দুধপুলি, পাটিসাপটা, মালপোয়া, ক্ষীর পিঠা, রসবড়া...এত কিছু বানাইছে, রাতভর লীলাবালি লীলাবালি বড় যুবতী...বিবাহের গান গুনগুন করে আর পিঠা বানায়, কী পিঠা বানাইছে, দেখতে চলেন স্যার।

গোপাল দাস যেভাবে ডাকতে থাকে তাঁদের, তাকেই হয়তো বলে কাতর আবেদন। তারা যাবে না যাবে না করে রওনা হয় গোপাল দাসের সঙ্গে। পায়ে হাঁটা পথ। তবে পথটি সোজা নয়। একটু গিয়ে বামে ঘুরে আবার ডানদিক। ডানদিকে হেঁটে আবার বাম। সেই পথেই রাজার বাড়ি, যেখানে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ আশ্রয় নিয়েছিল। তারপরে অনেকটা গিয়ে আর এক শরিকের বাড়ি, গোপাল দাসের বাসা। জটিলতায় ভরা সব। রাজার বাড়ির পথ সহজ হয় না নিরাপত্তার জন্যই বুঝি। ওই ধ্বংসস্তূপের সামনেই প্রথম দেখা সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধর সঙ্গে। আর তখন দূরে, অনেকটা দূরে দুই কন্যা ছিল মনে হয়। বিপুলের তেমন মনে হতে থাকে। কিন্তু না হতেও পারে তা। অন্য কেউও হতে পারে। আবার কুয়াশায় ভুল দেখেছে সে এমনও হতে পারে। যদি সত্য দেখে তাকে বিপুল, তখন কি তারা পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিল? মা নেই, এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরতে বাধা নেই। নজরে যেন এসেছিল তারাই। তখন কুয়াশা সামান্য কেটেছে। তার ভিতর থেকে গাছ-গাছালি বাড়ি ঘরদোরের মতো দুই মেয়ে মুখ দেখাচ্ছিল। বুকের দুই পাশে দুই বিনুনির গোড়ায় লাল ফিতের ফুল। তারাও বুঝি দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কারা এল? কারা ওরা, দুই যুবক? সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধ তাদের স্বাগত জানিয়েছিল, ওয়েলকাম স্যার, ক'দিন ধরে ওয়েট করতিছি স্যার, এবার বড় কিছু একটা ঘটবে। কী ঘটল, না কুয়াশা তাদেরই গিলে নিল।

গোপাল তাদের আগে আগে হাঁটছিল, বলছিল, তারা কেমন পুরুষলোক, মেয়ে দুইটা পিঠা করল, এলনি খেতে, মনে ঘা দিয়ে গেল, মেয়েদের মনে আঘাত দিতে নেই, নারী ঈশ্বরী...। গোপাল দাস একই কথা গুনগুন করতে করতে বিপুল এবং অতীনকে তার বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। তারপর আচমকা কথা থামাল।

কথা থামিয়ে দিল কেননা তারা রাজবাড়ির প্রায় ধ্বংসস্তূপে এসে পৌঁছেছে। ভাঙা বারান্দায় শালোয়ার কামিজ পরা বিনুনি ঝোলানো দুই কন্যা দাঁড়িয়ে। তারা বুঝি ভেবেছে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ, দুইজনকে নিয়ে বাবা ফিরে এসেছে। তারা তাদের নয়নের মণি, হৃদয়ের ফুল, তারা তাদের দেখিতে ব্যাকুল। এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর, আলোকে মোর চক্ষু দুটি, মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি...।

একজন, সে রুমি, বেণী দুলিয়ে বলে উঠল, বাবা বাবা, ধরে নিয়ে এলে, আজ বেঁধে রাখব ঠিক।

আর একজন, সে ঝুমি, বলে উঠল, হ্যাঁ ভাত-জল দেব, পিঠা-পুলি দেব, কিন্তু টং-টং করে ঘুরতি পারবা না, বুঝলা, যত্ন নিতি এখেনে থাকতি হবে?

মেয়েরা বিভ্রমে পড়েছে আপাদমস্তক জ্যাকেট, মাফলার, হনুমান টুপিতে দুজনকে দেখে। দুইজন যখন, তারাই হবে।

গোপাল দাস বলে উঠল, তারা না খুকি, তারা না, তাদের কী ঘটেছে কী ঘটেনি, কারুর নেই জানা খুকি, সবই অজানা, এঁদের কাছ থেকেই তারা কুয়াশায় হারিয়ে গেছে শুনতিছি।

রুমি ঝুমি ঘরে ঢুকে গেল মুহূর্তেই। যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল। গোপাল চাপা গলায় বলল, দেখুন স্যার, তারা কী করে গেছে আমার মা মরা মেয়ে দুটারে, ভেঙে পড়েছে, দুই বুন পিঠা বানালো আর তারা না খেয়ে উধাও হলো, এই দুঃখে কাতর হই গিইছে ছেমড়ি দুটা, মা মরা মেয়ে।

আসলে এই মস্ত দালানের সবটাই প্রায় ভেঙে পড়েছে। যেটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে গোপাল দাস, সেইটুকুতে তার বাস। দালান সংস্কারের ক্ষমতা নেই তার। ধ্বংসস্তূপে শীতলতা প্রবাহিত হতেই থাকে। মৃতের বাসস্থান হয় ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু এই বাড়ি তা হতে হতেও হয়নি। বিপুলের মনে হতে থাকে গোপাল দাসের হয়তো গোপন ইচ্ছে ছিল গারো পাহাড়ের কোলের বাসিন্দা প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ, দুইজনের হাতে রুমি, ঝুমিকে অর্পণ করবে। তারা ঘর জামাই হয়ে থাকবে এখানে। রাজার বাড়ির আরও একটুখানি সারিয়ে-সুরিয়ে নেবে। তাদের নাকি সাতকুলে কেউ নেই। সবাই মরে গেছে। তাই মায়া পড়ে গিয়েছিল গোপালের। আর দুই মেয়ের কী হয়েছে তা তারাই জানে। রং লেগেছে মনে। কিন্তু প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ চলে গেছে পিঠে-পুলি স্পর্শ না করে। তারা ভিতরে ঢুকে দেখল কাঁঠাল কাঠের পিড়ি দুটি। তার সমুখে সাজানো বড় দুই কাঁসার থালায় পিঠে-পুলি, কাঁসার গ্লাসে জল, সব রেডি কিন্তু ঘরে কেউ নেই। নিঝুমপুরি হয়ে আছে এই ঘরবাড়ি।

গোপাল ডাকল, ও রুমি ও ঝুমি, এই ঘরে আয়।

রুমি, ঝুমি সাড়া দিল না। কিন্তু গোপাল বলল, আসবে স্যার, আসবে, আগেরবার যখন উধাও হয়েছিল এমনি হয়েছিল, তারা বিরিয়ানি রাঁধতে বলে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, রুমি ঝুমি দিনভর বিরিয়ানি রেঁধে কাঁদতে বসেছিল, পিঠার বেলায়ও যে তা হবে তা বুঝা যায়নি, আমি এখন সব মনে করতে পারতিছি।

তারা বসেছে একটি তক্তপোশে। বাড়ির ভিতরটা যেন আরও ঠান্ডা। মেঝেতে বরফের চাঙড়। পা তুলেই বসল দুজনে। পুলি-পিঠে অনেক রকম। কিন্তু খাবে কে? তাদের মিষ্টান্নে অরুচি। অতীনের সুগার নেই, তবু মিষ্টিতেও রুচি নেই। আর বিপুলের সুগার সীমান্তরেখা অতিক্রম করবে করবে। তার খাওয়া বারণ, কিন্তু নতুন গুড়ের সুগন্ধে মনে হচ্ছে গিয়ে বসে একটি আসনে। দেখতে বেশ ভালো লাগছে। কত ভালোবাসা সাজানো রয়েছে সামনে। ভালোবাসার যে এমন এক সুগন্ধ হয়, তা বিপুল জানত না যেন। তাই ওই আসনে তাদের বসা অনুচিত। রুমি ঝুমি কি তাদের জন্য রাত জেগেছিল?

অতীন জিজ্ঞেস করলেন, সেবার বিরিয়ানি কী করলেন?

আঁজ্ঞা, গরিব লোককে বিলি করা হল, মেয়েরা এক দানাও মুখে দেয়নি কেউ, আমিও না। বলল গোপাল দাস, মেয়েরা তো উপাস দিল দুদিন, উপাস দিয়া কী গান গুনগুন করল, বিবাহের গান, গীতিকার গান।

আহা, এত যে শুনতে পাবে দেখতে পাবে তা ভাবেইনি বিপুল। দুই প্রেমিক চলে গেছে, দুই বোন উপোস করে বিবাহের গান গাইছে দিনভর। বাইরে কুয়াশা আর শীতে সব ঢেকে গেছে।

লীলাবালি লীলাবালি
বড় যুবতী সই গো
কী দিয়া সাজাইমু তোরে।
হাত চাইয়া বালা দিমু,
মতিয়া লাগাইসে সই গো
কী দিয়া সাজাইমু তোরে।।

বিপুল যেন শুনতে পাচ্ছিল সেই বিবাহের গান। দুই বোন উথলি ওঠা দুধের কড়ায় পুলি ফেলতে ফেলতে গুনগুন করছে।

তার গ্রামে গিয়ে ডেকে আনলেন না কেন, সাইকেলে চলে যেতেন। অতীন বললেন।

মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকে গোপাল দাস। তারপর বলল, গিইছিলাম স্যার, কিন্তু গাঁ খুঁজে পাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে পাননি মানে? অতীন অবাক।

গাঁ হারায় গিয়েছে। বলল গোপাল।

গ্রাম হারিয়ে যাবে কী করে? বিপুল না পেরে জিজ্ঞেস করে। গোপাল দাস লোকটিকে তার অদ্ভুত লাগছে। বাড়িতে দুই যুবতী কন্যা, অথচ দুই অচেনা যুবককে পিঠা খাওয়ার নেমন্তন্ন করে। তাদের চিনতই না বোঝা যাচ্ছে। আর সেই প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ চলে যাওয়ার আগে এই সব ঘটিয়ে দিয়ে যায়। দুই কন্যার চোখে জল দিয়ে নিষ্ঠুর প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ চলে যায়। বিপুল জিজ্ঞেস করল, গ্রাম কী করে হারায়, আপনি গিয়েছিলেন সত্যি?

ইয়েস স্যার, গিইছিলাম, একেবারে গারো হাড়ের ধারে বলা যায়, কিন্তু আশুথতলী বলে গ্রাম এখন আর নাই।

আগে ছিল? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

তা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু কুসুমতলী গাঁ-র বুড়ারা বলল, সে গাঁ নাই। বলল, নাই কেন তা বলতে পারবে না।

বিপুল বলল, তা হয় নাকি, গাঁ যাবে কোথায়, গাঁয়ের তো পা নেই, ওড়ার ডানা নেই।

এইডা তো আমারও কথা, যাবে কোথায়? বলল গোপাল।

জিজ্ঞেস করেননি আশুথতলী গেল কোথায়? অতীন সরকার জিজ্ঞেস করলেন।

আঁজ্ঞা করেছি, তারা বলল, অমন গাঁ-র কথা জানা নাই, সেখেনে কুসুমতলীই আছে, আশুথতলী নাই, এমন হতি পারে, আশুথতলীর নাম উয়ারা কুসুমতলী করে দিয়েছে, একই গাঁ, উত্তরে আশুথতলী, দক্ষিণে কুসুমতলী। গোপাল বলতে বলতে মাথা ঝাঁকাতে থাকে, বুড়ারা মিথ্যা কইছে, না তারা কইছে, তা বুঝা যায়নি।

তুমি কি আবার যাবে? জিজ্ঞেস করলেন অতীন। এতক্ষণে অতীনের সম্বোধন বদলে গেছে ঘটনায় নিজেও জড়িয়ে যেতে থাকায়।

বুঝতি পারতিছিনে যাব কি যাব না, সেই বুড়ারা আবার ধরবে, তারা চা দোকানে বসে থাকে আর অচেনা লোক দেখলে জেরা করে সাইকেল থামিয়ে, বলবে আশুথতলী নাই, সবই কুসুমতলী, আর পবুদ্ধ, সুবুদ্ধ নাই, রাম শ্যাম যদু মধু, এসমাইল, মজিদ, সুলেমান, মোজাফফর আছে, তারা কেউ সুবুদ্ধ না, পবুদ্ধও না। বলতে বলতে থেমে গেল গোপাল দাস। দুই মেয়ে ঢুকছে ঘরে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে একজন বলল, বাবা, তুমি মিছে কথা বলতেছ, তুমি যাও নাই আশুথতলায়।

কেডা বলল যাই নাই? গোপাল জিজ্ঞেস করল।

দুজনই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল, দুজনের চোখের কাজল ধুয়ে গেছে, গণ্ডদেশে অশ্রুর চিহ্ন লেগে আছে, তাদের একজন লাল চাদর গায়ে রুমি বলল, পবুদ্ধ বলে গেছে।

আর একজন নীল চাদরে ঢাকা, ঝুমি, বলল, সুবুদ্ধ বলে গেছে।

তারা কবে বলল? গোপাল জিজ্ঞেস করে।

তারা বলে গেছে বলতিছি, আর কিছু বলা যাবেনি। রুমি বলল।

তোদের সাথে তাদের কথা হতো? জিজ্ঞেস করে গোপাল।

রুমি বলল, সব তোমারে বলা যায় না, আমরা বড় হয়েছি এখন, গুপন রাখতি হয় কিছু।

গোপাল বলল, গোপন রাখ, কিন্তু সেই কারণ আমি জানি, পিঠা খেতে বলা তাই।

যাকগে বাবা, তারা আসেনি আসেনি, আশুথতলায় তুমি যাওনি যে তা বলে গেছে তারা। আবার রুমি বলল। ছোট মেয়ে ঝুমি চুপচাপ। দিদি আর বাবার কথা শুনেই যাচ্ছে।

তারাই মিছে কথা বলেছে। গোপাল বলল, তাদের জন্যি আমি কী হয়রান না হয়েছি, কুসুমতলী গাঁয়ের বুড়োরা মিছে কথা বলে নাই, সে গেরাম নাইই সত্যি।

নীল চাদর গায়ে ঝুমি এতক্ষণে বলল, নাই তো উড়ে গেল?

তারাই মিছে কথা বলেছিল, চায় না যে আমি তাদের ভিটায় যাই। গোপাল বলে।

রুমি বলল, প্রবুদ্ধ মিছে কথা বলার লোক না, সে তো ছিল ক'দিন এই দুর্গাপুরে, তুমি কি বলেছিলে তাদের যে সে গেরাম নাই?

গোপাল চুপ করে থাকে। আশ্চর্য! সে বলেনি কেন? বলতেই পারত। তাইই স্বাভাবিক হতো। জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল কেন? দুটি জোয়ান ছেলে, তার ঘরে দুই সোমত্ত মেয়ে। সব জিজ্ঞেস করে রাখাই ঠিক ছিল।

রুমি বলল, তুমি মিছে কথা বলেছিলে তো বাবা, তোমার কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তা কি আমরা জানিনে?

॥ তিন ॥

চুপ করে ভ্যাবলার মতো দুই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল গোপাল। ধরা পড়ে যাওয়া মানুষের মুখ এমনই হয় যেন। কিন্তু শেষ অবধি নিজের যুক্তি খাড়া করতে চায়। মাথা নাড়ে গোপাল, বলল, না, কিন্তু আমি জিগাস করি নাই, বলব বলব করে ভুলে গেলাম, বলার সময় হয় নাই।

তখন রুমি বলল, আরও যেতে হতো, তুমি কি জানতে না গারো পাহাড় একদিন পিছনে সরে গিয়েছিল।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, কে বলল?

রুমি বলল, প্রবুদ্ধ। ঝুমি বলল, সুবুদ্ধ।

আমারে তোরা তো বলিস নাই। বিমূঢ় গোপাল তাকিয়ে থাকে দুই কন্যার দিকে। সেই কবে হাতিখেদা হাজং জাতির বিদ্রোহ হয়েছিল, হাতির পায়ের তলায় চিপে মরেছিল হাজং চাষা মনা সর্দার, এই রাজার বাড়ি তাই করেছিল, তখন গারো পাহাড় আক্রোসে আগুয়ে এসেছিল, পরে পাহাড় ফিরে গিয়েছিল, বেশিটা সরে গিয়েছিল। রুমি বলল, যাতে হাতি আর না ধরা করতি পারে রাজার লোকে।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, আমি তো এসব জানিনে।

তুমি বড় মিছে কথা বলো বাবা, একদিন, মনে হয় পুন্নিমে ছিল, সেদিন কুয়াশা ছিল না, সে বলল হাতিখেদা হাজং বিদ্রোহের কথা, টঙ্ক চাষাদের লড়াইয়ের কথা, তুমি তা শুনো নাই, মোদের বলেছিল, আমরা সব তোমারে বলছিলাম। রুমি বলল বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে।

তা আমি ভুলি গিছি রুমি, কী বলেছে, কখন বলেছে, আমি জানব কী করে, ওদের সব কথা আমার কানে ঢুকত না, কিন্তু গারো পাহাড় সরে গেলে গেরামের কী? গোপাল জিজ্ঞেস করল।

গেরাম কি আর তখন স্বস্থানে থাকে বাবা, তুমি কি জানো আগে নেত্রকোনা থেকে গারো পাহাড় দেখা যেত, এখন যায় না। ঝুমি বলল।

গোপাল ঘাড় ঘুরিয়ে অতীন সরকারকে জিজ্ঞেস করে, তাই স্যার, দেখা যায় না?

না, দেখা যায় না। বললেন অতীন। আমার জন্মের আগে দেখা যেত কি না তা অবশ্য জানি না, কেউ কেউ বলে দেখা যেত।

তাইলে তো আমি ভুল করেছি স্যার। গোপাল মাথা নাড়তে থাকে। আরও গেলে আশুথতলা পাওয়া যেত হয়তো।

তখন রুমি জিজ্ঞেস করল অতীনকে, তারা কোথায় গেল?

হারিয়ে গেল।

অতীন বললেন, আমরা এর বেশি কিছু জানি না।

কিন্তু স্যার, ওরা নাকি বলেছিল, কিছু ঘটবে তাই এসেছে, কী ঘটল?

অতীন বললেন, কিছু ঘটেছে, কী ঘটেছে তা আন্দাজ করতে পারছি, মনে হয় তাই চলে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে, তোমরা দুপুরে আমাদের বাংলোয় এসো, আমি বলব কী ঘটেছে, কী আছে আমার হাতে আসা পাণ্ডুলিপিতে।

তারা দিয়ে গেল নাকি আপনাকে পাণ্ডুলিপি? জিজ্ঞেস করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমি।

না, তারা বিবাদ করেছে পাণ্ডুলিপির ঘটনা নিয়ে। অতীন জবাব দিলেন।

ও। রুমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তাঁদের দিকে কিংবা তাঁদের পেছনের দেওয়ালের দিকে।

গতকাল ঘটনা একটা ঘটেছে, তা বলবেন বলবেন করে, অবিশ্বাস্য তাই বললেন না। তারা হারিয়ে গেছে। আসলে তারা যে কারণে এসেছিল তা হচ্ছিল না। মানে কিছু ঘটছিল না। আগেরবার ঘটেছিল, কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ পায়নি। তারা বলেছিল জঙ্গি ধরা পড়েছে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের বাংলোতেই। গোপাল তা জানে। তারপরই তারা আর থাকেনি। বিরিয়ানির কথা আজ শুনেছেন অতীন। রুমি ঝুমি বিরিয়ানি রেঁধেছিল ওদের জন্য। আহা কেমন মন খারাপ করে বসে আছে দুজনে মেঝেয় মাদুরের উপর। পিঠের থালা ঢাকা দিয়ে দিয়েছে বড় দুই পেতলের গামলা উপুড় করে। অতীন ও বিপুল বাইরে এখন। ঘটনা একটা ঘটেছিল, গতকাল বিকেলে অতীন যখন পাণ্ডুলিপি খুলেছেন, কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, তখন প্রবুদ্ধ বলল, এসব তারা জানে, কিন্তু নতুন কিছু আছে কি না তা জানতে চায়।

এসব জানে মানে পাণ্ডুলিপিতে যা লেখা আছে এবং পাণ্ডুলিপির ভিতরে যা যোগ করছেন অতীন সব নাকি তাদের জানা। তারা সব গল্পই শুনেছে কিংবা দেখেছে। শুনতে শুনতে বিস্মিত অতীন বলেছিলেন, সবই যদি জানা থাকে, তাহলে তো না শোনাই ভালো।

প্রবুদ্ধ বলেছিল, তারা শুনতে এসেছে কিংবা জানতে এসেছে সেই খবর যা ঘটার কথা কিন্তু ঘটেনি তখনও, কিন্তু স্যারের পাণ্ডুলিপিতে আছে।

অতীন বলেছিলেন, তেমন কিছু তাঁর জানা নেই।

শুনেই সুবুদ্ধ বলেছিল, স্যার, সব যে জানা, তা না হতেও পারে, প্রবুদ্ধ বলে কী করে বলে সব তার জানা, আপনার জানা নেই মানে এমন হতে পারে যে, আসলে কিছু ঘটবে না।

প্রবুদ্ধ তাকে থামিয়েছিল, ঘটবে না বললেই হবে, আগেরবার তুই বললি কিছুই ঘটবে না, কিন্তু জঙ্গি ধরা পড়ল তো, সে কথা কেউ ভাবতে পেরেছিল, পারেনি, আমরা ফালতু আসিনি এতদূর।

আগের বছর এই শীতের সময় নাকি তিন জঙ্গি ধরা পড়েছিল। আর সেই ঘটনা আন্দাজ করেই তারা এসেছিল এখানে। একা প্রবুদ্ধর দাবি সে জানত অমন কিছু ঘটবে। ঘটবে বলেই সে এসেছিল অত শীতের ভিতরে। শুনতে শুনতে সুবুদ্ধ বলেছিল, জঙ্গি ধরা পড়ল আর কেউ জানল না?

আমরা তো জানি। প্রবুদ্ধ বলল।

সুবুদ্ধ বলেছিল, তুই একা জানিস, আমি তো জানি না, কেউ জানে না।

প্রবুদ্ধ বলেছিল, তুই জানতি কিন্তু ভুলে গেছিস, সব সময় অন্য দিকে মন, ভুলে মরিস সব।

মোটেও ভুলিনি, তুইই বলছিলি জঙ্গি ধরা পড়বে, তুইই বললি ধরা পড়েছে, অথচ কেউ জানল না। সুবুদ্ধ বলতে বলতে থেমে ঘাড় ঘুরিয়ে অতীনকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার আপনি কি জঙ্গির কথা জানেন?

না তো, জানি না, খবর হয়নি, কেউ খবর করেনি, টিভিতে খবর হয়নি, জঙ্গি ধরা পড়ত যদি এদিকে জানা যেত ঠিক, খবরের জন্য খবরিয়ারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নেত্রকোনা, সুসঙ্গ দুর্গাপুর— সব জায়গায়।

প্রবুদ্ধ বলেছিল, খবর হবে না তাই হয়নি, খুব সিক্রেট নিউজ, সব কথা পাবলিকের জানতে নেই।

সুবুদ্ধ বলল, তোর যত মিছে কথা।

মোটেই মিছে না, আপনার পাণ্ডুলিপিতে জঙ্গি নাই?

অতীন বলেছিলেন, না নেই।

আপনি স্যার ইচ্ছা করে বাদ দিয়েছেন, এবারও যা ঘটবে তা ঘটাতে চান না, পাণ্ডুলিপিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বাইরের কথা থাকার কথা, তাহলে জঙ্গি কেন থাকবে না? প্রবুদ্ধ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল।

বিপুল সোম নির্বাক হয়ে শুনছিল এইসব আশ্চর্য কথা। নিজের জন্মভূমি নয় বটে, কিন্তু পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি তো। সে দেখতে এসেছে কমলারানির সায়র। রানির ইচ্ছায় এক সায়র খনন করা হয়েছিল, কিন্তু সায়রে জল উঠছিল না। সায়র হয়ে উঠেছিল অন্ধকারের এক অনার্দ্র শুখা সমুদ্র। অতিকায় এক কবর যেন খনন করা হয়েছিল। রানির আত্মবিসর্জনে সায়র জলে পূর্ণ হয়ে যায়। রানি কমলা সায়রের জলে ভেসে যায়। এখন সেই সায়র বুজে গিয়ে মাঠ। দূরে দেখা যায় গারো পাহাড় থেকে নেমে আসা সিমসাং অথবা সোমেশ্বরী নদী। তখন অতীন তাকে পাণ্ডুলিপি থেকে শোনাচ্ছেন গীতিকার বাইরের কাহিনী যা ঘটেছিল এই মাটিতে। হাতিখেদা বিদ্রোহ, ধানের ভাগ নিয়ে কৃষক বিদ্রোহ আর কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন। প্রবুদ্ধর এসব নাকি সব জানা, তাই সে বলছে। সুবুদ্ধ আর প্রবুদ্ধে মিল নেই বোঝা যাচ্ছে। সুবুদ্ধ শুনতে চায় অতীন সরকারের লেখা পাণ্ডুলিপির কাহিনী,যা আসলে ইতিহাস। কিন্তু প্রবুদ্ধ বলছে, সব বোগাস, আজাইরা কথা, মিথ্যা কথা, আসল কথাই নেই। সে শুনতে চায় না। তা শুনে সুবুদ্ধ রেগে গেল, বলল, আজাইরা কথা বলিস কেন, তুই চলে যা, শুনতে হবে না।

তুই ফালতু কথা কইবি না। প্রবুদ্ধ গর্জন করে উঠল, যা শুনতে চাই তা কেন বলবেন না উনি।

কিন্তু তুমি এত কথা শুনেছ কার কাছ থেকে? অতীন থামাতে চাইলেন ওদের।

প্রবুদ্ধ বলল, আমার ঠাকুদ্দা বলেছিল।

তিনি বেঁচে আছেন? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

মাথা নাড়ে প্রবুদ্ধ, না, নাই তিনি, হারায়ে গেছেন।

কীভাবে? বিপুল যেন আরও এক কাহিনীর সন্ধান করছিল।

আজ্ঞে, সে ছিল কুয়াশার দিন, উনি তার ভিতরে হেঁটে গেলেন, আর ফেরেননি। বলল প্রবুদ্ধ।

কবে গেলেন? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

আজ্ঞে, কুয়াশায় ঢাকা দিন, তারে কি মনে থাকে?

তোমাদের বয়স কত? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

আজ্ঞে, ওর যা বয়েস, আমারও তাই। সুবুদ্ধকে দেখায় প্রবুদ্ধ।

সুবুদ্ধ বলল, এইটা ঠিক না, আমি আমার বয়েস জানি না।

প্রবুদ্ধ বলল, আমি জানি এইটা, ঠাকুদ্দা বলেছিল।

তখন অতীন বললেন, বয়সও কুয়াশায় ঢাকা।

প্রবুদ্ধ বলল, ঠাকুদ্দার কথা তো আমি বললাম।

সুবুদ্ধ বলল, আমার বয়স কত তা বলে যায়নি ঠাকুদ্দা?

তোর জানা উচিত, তোর ঠাকুদ্দা কী বলে গেছে?

সুবুদ্ধ বলল, ওই কথাই, প্রবুদ্ধর যা বয়েস..., বয়েস নিয়ে কী হবে, কথা শুনতে দে।

প্রবুদ্ধ বলল, কথা শুনার কিছু নেই।

নেই মানে? লেগে গেল দুজনের ভিতর। সুবুদ্ধ লাফ দিয়ে উঠে প্রবুদ্ধর জামার কলার ধরে, চুপ করে বস, শুনতে দে।

আসল কথাই হচ্ছে না, কী শুনব? প্রবুদ্ধ ঠেলে সরিয়ে দেয় সুবুদ্ধকে।

আসল কথাই হচ্ছে। বলল সুবুদ্ধ।

না হচ্ছে না। বলল প্রবুদ্ধ।

তখন সন্ধে নেমে এসেছে। তার সঙ্গে কুয়াশা। জানালার বাইরে কুয়াশায় মিশে গেছে অন্ধকার। লাগল দুই মামাতো পিসাতো ভাইয়ে। লড়াই। হ্যাঁ, না। হ্যাঁ, না। ধেয়ে গেল একের দিকে অন্যে। প্রবুদ্ধ ঘরের বাইরে চলে গেল সুবুদ্ধকে টানতে টানতে। রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেমে গেল তারা। অতীন বারান্দা থেকে ডাকছিলেন, আরে কী করছ, ভিতরে এসো, খুব শীত আর কুয়াশা!

কে কার কথা শোনে। শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই শুরু হয়ে গেল চোখের সামনে। লড়াই করতে করতে তারা আচমকা নেমে আসা কুয়াশায় ঢুকে গেল। তাদের গর্জন ক্রমশ কমে আসতে লাগল। কুয়াশা তাদের ধীরে ধীরে গিলে নিয়েছিল কলসপত্র উদ্ভিদের মতো। সেই শেষ দেখা। তারপর দু'জনে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন টর্চ হাতে। ল্যাম্পপোস্টের আলো কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছিল। ওদের আর পাওয়া যায়নি। অনেক ডেকেছিলেন দুজনে, কিন্তু উত্তর আসেনি। চারদিকে তখন অনন্ত নিঝুমতা।

সেই রাতে বিপুলের ঘুম হয়নি ভালো। ওরা কারা? অদ্ভুতভাবে আলাপ, অদ্ভুতভাবে বিদায়। ওরা গেল কোথায়? হারিয়ে গেল কুয়াশার ভিতরে! কুয়াশায় হারালেও ফিরে তো আসে। ফিরে এল না ওরা। দু'দিন কেটে গেছে। ওদের কাছে মোবাইল ফোন ছিল। ফোন বন্ধ হয়ে আছে। দুটো মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল!

অতীন বলেছিলেন, গারো পাহাড়ের দেশে এমন হয়।

কী হয়? বিপুল জিজ্ঞেস করেছিল।

যা দেখলেন, তাই, এমনি ঘটে যায়। অতীন বলেছিলেন, পাহাড় এগিয়ে আসে, পাহাড় পিছিয়ে যায়।

ওসব রূপকথা আর নানা উপাখ্যান আর আখ্যানে লেখা হয়, কিন্তু মানুষ দুটোর কী হল?

যা ঘটল, সেই ঘটনার কথা নিয়েই এসেছিল প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ, লোকদুটোকে কুয়াশা গিলে নিল। অতীন বিড়বিড় করে বলেছিলেন, প্রবুদ্ধ ঠিক।

ঠিক মানে?

কিছু একটা ঘটার কথা বলছিল প্রবুদ্ধ, তাইই হল।

ঘটল তাই? বিপুল জিজ্ঞেস করেছিল, অদৃশ্য হল?

হ্যাঁ, এইটাই ঘটার কথা ছিল হয়তো। অতীন বলেছিলেন, কলসপত্র উদ্ভিদের মতো কুয়াশা গিলে নিল ওদের, এই কথাই সে শুনেছিল, দুটো মানুষকে গিলে নেবে কুয়াশা।

আর কথা হয়নি সেই রাতে। অবিশ্বাস্য লাগছিল সবটা। এখনও অবিশ্বাস্য লাগছে সব। রুমি ঝুমি আর তাদের বাবার মিছে কথা, সত্যি কথা, সব অবিশ্বাস্য লাগছে। গোপাল দাস মাথা নামিয়ে বসে আছে। ঘর নিস্তব্ধ। অতীন আর বিপুল উঠে বেরিয়ে এসেছেন। বাইরে কুয়াশা একটু কম। অন্তত সামনের একশো-দেড়শো ফুট দেখা যাচ্ছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। দূরে যা দেখা যাচ্ছে না, কুয়াশায় ডুবে আছে, সেই কুয়াশা ভেদ করতে চেষ্টা করছিল বিপুল। দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, কে মিথ্যে বলেছে?

কেউ না। অতীন বললেন, সকলেই সত্যি বলেছে, বানিয়েছে কথা।

॥ চার ॥

সবই সত্য? বিপুল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্য আবার বানানো কথাও, সত্য বানানো যায়?

কুসুমতলীর নাম আমার মনে পড়ে গেল। বললেন অতীন। তাঁরা হাঁটছিলেন নদীর দিকে। নদীর সবটাই কুয়াশা মোড়া হয়ে আছে। এপার-ওপার দেখা যায় না। গাছ-গাছালি, বালি তোলার লরি, পারাপার করা মানুষজন, খেয়া, সব ঢাকা পড়ে আছে। অতীন বলছিলেন, তিনি গারো রাজার প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলেন পাহাড়ে, তখন কুসুমতলী আর আশুথতলী দুই গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন একটা গ্রামের গায়ে আর একটা গ্রাম লেগে ছিল, সীমান্ত এক ঝর্ণা, গারো পাহাড়ের সঙ্গে গ্রামও পিছিয়ে গেছে হয়তো।

এমন হয় নাকি? বিপুল বিড়বিড় করে বলল, হয় না।

হয়, হবে না কেন, হয়েছে তো। বললেন অতীন।

বিপুলের মনে হল প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ কুয়াশার ভিতর থেকে আচমকা বেরিয়ে আসতে পারে। গোপাল দাসের মেয়েদের খুব যন্ত্রণা দিয়েছে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ। ইস, মেয়েদুটো রাত জেগে পিঠে তৈরি করল, তোরা ফালতু ঝগড়া করতে করতে হারিয়ে গেলি!

অতীন বললেন, চলুন ফিরি, প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ-র কথা ভাবুন, ওরা কিছু ঘটাতে এসেছিল, ঘটিয়ে চলে গেছে।

ঘরে ফিরতে সময় লাগল। ঘরে ঢুকে বিপুলের মনে হল সবটা সত্য নয়, সবটাই মিথ্যে। মেয়েদুটি, রুমি, ঝুমি পুতুল খেলতে খেলতেই যেন পিঠে বানিয়েছে। দুই বোনের খেয়াল হয়েছে বানিয়েছে। প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ, কেউ আসবে না, তা জানত। সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধ তার বাবার গল্প। বাবা খুব মিছে কথা বলে। এদেশের ভাষায় আজাইরা কথা। বিপুলের এখন মনে হচ্ছে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ বলে কেউ যেন আসেনি এই ঘরে। পাণ্ডুলিপির ভিতরে আছে তারা। উপাখ্যানের প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ হাঁটু মুড়ে বসে আছে কুয়াশার ভিতরে কোনও গাছতলায়। অতীন বললেন, কুয়াশা থেকে এসে কুয়াশায় ঢুকে গেল। কবি কল্পনায় ময়মনসিংহে এমনি হতো, কবির দেশে এমনি হয়। নেত্রকোনায় এমন ঘটে থাকে। সুসঙ্গ দুর্গাপুরে, সোমেশ্বরী বা সিমসাং নদীর ধারে এমনিই দেখা যায়। খুঁজলে একশো দেড়শো দুশো বছরের মানুষ পাওয়া যাবে এখানে, অনেক অনেক বয়স নিয়ে হাঁটছে, নদীর ধারে, গাছতলায় বসে আছে।

বিপুল কিছু বলবে ভেবেও বলল না। একশো দুশো তিনশো বছরের মানুষ! মানে একশো, দুশো, তিনশো বছরের স্মৃতি। ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের কল্পনা। মানুষ তো নিজেই স্মৃতিপুঞ্জ। স্মৃতিই মানুষের জীবন গড়ে তোলে। সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধ বলে কেউ যদি এই সন্ধ্যায় এসে থাকে তবে তা আসলে স্মৃতিপুঞ্জেরই এক বিন্দু যা অতীন আহরণ করেছেন এতটা জীবন এই কবির ভূমিতে বসবাস সূত্রে। কিন্তু এ তো বিপুলের যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা। আসলে এই কবির ভূমিতে এমনই ঘটে থাকে। যে মানুষটি মহুয়া, মলুয়া কিংবা কমলা সায়রের কথা বলছে পথেঘাটে, যে মানুষটি চায়ের দোকান করে বসে আছে বেল চা নিয়ে, যে মাঝি নৌকো নিয়ে পারাপারের জন্য বসে আছে কংস নদীর ঘাটে, যে লোকটি গাছতলায় বসে আছে নিঝুম হয়ে, তারা সকলেই দেড়শো দুশো বছরের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। তাদের বয়স রামায়ণ মহাভারতের যুগের মানুষের মতো, কবির দেশে এমনি হয়। তাদের বয়স গারো পাহাড়ের বৃক্ষের মতো। গারো পাহাড়ের দেশে এমনি হয়।

গারো পাহাড়ের দেশে কত কিছু হয়েছিল। ধান নিয়ে রাজা-জমিদার আর চাষায় লেগেছিল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের কথা কোনও গীতি কাহিনীতে নেই। ময়মনসিংহ ছিল অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে বড় জেলা। নেত্রকোনা তার মহকুমা। সুসঙ্গ দুর্গাপুর থানা। এখন নেত্রকোনা জেলা হয়েছে, আর দুর্গাপুর হয়েছে উপজেলা। রাজা সোমেশ্বর পাঠকের নামে গারো-হাজংদের সিমসাং নদীর নাম সোমেশ্বরী হয়ে গিয়েছিল, আর রাজার রাজত্বের মহিমা বোঝাতে সুসঙ্গ হল দুর্গাপুর। সেখানে চাষার ধান রাজার ঘরে যেত। কী করে যেত, না টঙ্কের নিয়মে যেত। টঙ্ক প্রথায় বিনি নজরানায় নিষ্কর জমি বিলি করেছিল রাজা- জমিদার। বিনি পয়সায় জমি নাও, বছরে এই পরিমাণ ধান দাও। ধান তোমাকে দিতেই হবে। খরা বন্যায় ধান না হলে ধানের দামে টঙ্ক। টাকা। এই প্রথার নাম টঙ্ক। খরা হোক বন্যা হোক টঙ্কের ধান দিতেই হবে। তিন বিঘের জমিতে সাত মন ধান। তিন বিঘের খাজনা সাত টাকা, কিন্তু সাত মন ধানের দাম পনেরো-ষোলো টাকা। খাজনা দিলে লাভ থাকে, ধান দিলে, এই টঙ্ক প্রথায় চাষা নিঃস্ব হয়। অতি ধূর্ত এক গোমস্তার মাথা থেকে বেরিয়েছিল এসব। টঙ্ক প্রথায় জমি বিলি করে লাখ টাকার হাতির চেয়েও বেশি আয় করার উপায় খুঁজে পেয়েছিল রাজা।

চাষা বলল, টঙ্ক দেব না, খাজনা দেব। না হয় ধানের তিন ভাগের এক ভাগ দেব। সেই কাহিনী শোনাচ্ছেন অতীন। শুনে যান, পিতৃভূমির সব ইতিহাস শুনে যান। ময়মনসিংহ গীতিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের আখ্যান এই কাহিনী। গারো পাহাড়ের এই দেশে হাজং চাষিদের সেই বিদ্রোহের কথাই বলবেন অতীন। বলবেন তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে। দুপুরে রুমি ঝুমিও শুনতে আসবে। সেই প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ টঙ্ক আন্দোলনের সময় এসেছিল নাকি?

টঙ্ক দিব না, দিব না, এমন রবে কালেক্টরের পেয়াদারা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকে। সরকার বাহাদুর বলেছে টঙ্ক দিতে, দিবে না কেন, যতটা পারো দাও, বকেয়া দিবে পরের সনে, সরকার বাহাদুরের প্রজা সব, রাজা, জমিদার, তালুকদার সরকার বাহাদুরের এজেন্ট। সরকারের কথায় তাঁদের অন্তঃকরণ ভালো হয়, মন্দ হয়। যাও, টঙ্ক দিয়া আসো, যা পারবে দাও, পরের সনে বকেয়ার সঙ্গে আসল। পরের সনে টঙ্কের সঙ্গে বকেয়া? সাবেক আর হাল মিলে পাহাড় হয়ে যাবে টঙ্কের দেয়। বকেয়া বেড়ে যাবে ক্রমশ। বাড়ুক কিন্তু টঙ্ক দিতে হবে। অঘ্রানে ধান উঠলে টঙ্ক আদায়ের ধুম ওঠে। রাজার গোমস্তা, সিপাই, লেঠেল গ্রামে গ্রামে ঘোরে, টঙ্ক দাও। হিসেব করে টঙ্ক নেবে রাজার বাড়ি। মণি সিং-এর কথা শুনলে মরেছ। মণি সিংকে ধরতে পারলে জেলে ঢোকাবে ব্রিটিশ সরকার। এই সব কথা চোঙায় ফুঁকে ছড়িয়ে দেয় চোঙদার। রাজার এক সেপাই যেমন রাজার ভাগিনেয় মণি সিংয়ের বাড়ি যায় অন্য সেপাইরা তেমন হাজং চাষার ঘরে ঘরে যায়। টঙ্ক দাও, নইলে বিপদ হবে।

মণি সিং ছিলেন কংস নদীর তীরের পূর্ব ধলার জমিদার বাড়ির ছেলে। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের সিংহ রাজবাড়ি ছিল মণি সিংয়ের মাতুলালয়। তিনি হাজং চাষাদের পক্ষে গিয়ে নিজের জমির চাষাদের টঙ্ক মকুব করে সব দান করে দিলেন। মণি সিং হাজং চাষাদের নিয়ে মিটিং করে করে টঙ্ক দেওয়া বন্ধ করালেন। সঙ্গে এক হাজং শিক্ষক ললিত সরকার। ললিত হাজং। মিটিং হতো রাত দুপুরে, গোপনে। টঙ্ক আদায়ের জন্য থানা পুলিস দিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করেছিল রাজা-জমিদার, বড় রায়তরা। কিন্তু চাষ করে যদি প্রায় সব ধান যদি রাজার খামারে, জমিদারের খামারে তুলে দিতে হয়, ভুখা পেট ভরবে কী দিয়ে? মণি সিং আর ললিত হাজং বলল, রুশ দেশে বিপ্লব হইসে, শ্রমিক কৃষকের শাসন হইসে, আমরা করব জয়, বিপ্লব আমাদের দুয়ারে। সবাই কহ,

ধান দিবা না, না না না।/ ধানের ভিতর চাষার কান্না।।
টঙ্কের টাকা, টঙ্কের ধান।/ সব চাষাদের প্রাণ আর জান।।

তবু চাষাদের রাজার সিপাইয়ের ভয়ে কেউ কেউ সন্ধের অন্ধকারে টঙ্কের ধান নিয়ে রাজার বাড়ি রওনা হয়ে ধরা পড়ে যায় বিদ্রোহী চাষাদের হাতে। তারা পাহারা দেয় গ্রাম। ঘরের ধান যেন রাজা-জমিদার না পায়। কুথা যাও? হাজং প্রহরী জিজ্ঞেস করে। তারা আটকায় ধান সমেত গো-গাড়ি, ধান যাবে না, গাড়ি, আর যাবা না।

টঙ্কের ধান কেন দিবা।/ সম্বৎসর উপাস দিবা।।
মনি সিং কইসে,/ বিবাদ জারি রিইসে।
সিকি ভাগ দিয়া হবে,/ এক সিকিতে শোধ হবে।।

টঙ্ক প্রথায় চাষের জন্ম হাতিখেদা করে হাতি ধরা বন্ধ হতে। হাতি খেদিয়ে ফাঁদে ফেলতে হাজংরা ছিল ওস্তাদ। গারো পাহাড় হাতির দেশ। হাতি ধরতে হাজংদের গারো পাহাড়ের নীচে বসত করিয়েছিল সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজা। বনের ভিতরে ঢুকে হাজং পুরুষ হাঁক মারত, ওরে ও হাতি, হাতি কান পেতি হুন, ইধার-উধার করলে তুর কপালে আগুন, হুন হাতি, কান পেতি হুন, কুনা কুনা যাওরে হাতি, উতরদিকা যাও...।

উত্তরে গিয়ে হাতি ফাঁদে পড়ল। মানুষের কেরামতি হাতি বুঝতেই পারে না, তাই দল ছেড়ে খেদার দিকে হেলে দুলে যায়। হাতি তার জন্য পাতা লতাপাতায় ছাওয়া দুর্গ চেনে না। তাকে খেদিয়ে এনে তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই হয়। কেরামতি খতম। ধরা পড়ে গেল সে। হাতি তার এই 'খেদা' চেনে না। যেমন জাল চেনে না মৎস্য, খেদার ভিতরে কলাবন আর তারাবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারাগাছ ছোট ছোট গুল্ম, হাতির খাদ্য। খাদ্যের লোভে হাতি ফাঁদে ঢুকে গেল। ভাবল সে বুঝি অঘোর জঙ্গল। বনের পশু বন চিনল না, চিনল তার গুষ্টিমারা কল, বাঁশ, শালখুঁটি দিয়ে বানানো দুর্ভেদ্য এক দুর্গ। ফাঁদ। ঢুকলে বেরবার উপায় নেই।

এমন করে হাজং জাতি হাতি ধরে দিত, আর সেই হাতি বেচে রাজার ঘরে মণিমাণিক্য আসত। এক এক হাতির সোনার ওজনে দাম। কিন্তু হাজং জাতি একদিন বিদ্রোহ করল, হাতিখেদা করবে না। হাতিখেদা মস্ত পাপ। সে হয়েছিল ভয়ানক বিদ্রোহ। আর হাতি ধরব না। কত চেষ্টা হল দমন করার, হল না। ফলে হাতিখেদার নতুন আইন করেছিল মহারানি ভিক্টোরিয়ার সরকার। কিন্তু সে আইন গারো পাহাড়িয়া হাজংদের কোনও সুবিধেই দেয়নি, তাই তাদের ক্ষোভ বিদ্রোহ চলছিল। এরপর ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৪ সালের ১৯ মে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজার কাছ থেকে হাতিখেদা তৈরির অধিকার নিয়ে নেয়। হাতি ধরা বন্ধ হল রাজার অধীনে। হাতিখেদাও বন্ধ হল। বন্ধ হতে রাজার আয় বন্ধ হল। রাজার চলবে কী করে, খাজনা আদায় করতে হবে অনেক বেশি। রাজার কম বুদ্ধি! রাজার চেয়ে রাজার গোমস্তা, আমিন, মোহরার, তসিলদারের বুদ্ধি আরও বেশি। রাজাকে তারা বুদ্ধি দেয়, জমি সব বিলি হয়ে যাক বিনা নজরানায়। তারপর বৎসরান্তে নির্দিষ্ট টাকা কিংবা টাকার দামে ফসল দেওয়ার চুক্তি হোক। চাষারা ঠকে গেল। বুঝল টঙ্ক প্রথায় চাষ করে চুক্তির ফসল দিয়ে ঘরে কিছু থাকে না। টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের দাবি ছিল, পাঁচটি। যেমন, ১) টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ। ২) চাষার জমিতে চাষার স্বত্ব। ৩) জোতের পরিমাণ অনুযায়ী টঙ্ক জমির খাজনা বসানো। ৪) বকেয়া টঙ্ক মকুব। ৫) জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ।

পাঁচ দফার জন্য চাষিরা লড়ছে মণি সিংহের ডাকে। তার অন্যথা হবে কেন। টঙ্কের ধান দিয়া হবে না। দিবে তো দাও সিকি ভাগ। সিকি ভাগ সিকি ভাগ। এক সিকি ভাগ রাজায় পাবে, তিন সিকি ভাগ চাষায় খাবে। রব উঠল,

এক সিকির বেশি হবে না ধান,/ যায় যাবে যাক, রাজার মান।

সিকি ভাগ রাজা-জমিদারের ভাগ। তা নিয়ে খুব গোলমাল হল। চাষাদের ভয় দেখাতে সিপাই ঢুকল গাঁয়ে গাঁয়ে। কিন্তু ধান সেই উৎপাদিত ফসলের এক সিকি। সিপাইরা এসে বলতে লাগল, নতুন ফরমান, সরকার বাহাদুর এখনও গোরা সিপাই পুলিস পাঠায় নাই, তারা এলে অনর্থ হবে। শুনহ নতুন ফরমান, পাঁচ দফা ভুল দফা, টঙ্ক রহিব, টঙ্কেই হবে রফা। সেপাই যতই চোখ রাঙাক, চাষিদের মরণপণ। টঙ্ক দিব না। সিকি ভাগ কেউ দেয়, কেউ দেয় না। বানায় ফসল মরে, পেটের ভাত আগে তারপর তো রাজা, জমিদারের ভাগ। মণি সিং, ললিত সরকার মশায়, তিনি হাজং জাতির মানুষ, তখন কমিউনিস্ট পার্টির লোক। তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন, বিপ্লব হয়ে গেল প্রায়। বিপ্লবের স্বপ্ন দ্রষ্টা পুরুষ দুইজনে। রুশ দেশের কমরেড লেনিনের কথা শোনান তাঁরা। ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের তখন টনক নড়ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কড়া নাড়ছে দুয়ারে। কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে চাষারা জোট বেঁধেছে। এরপর ধানই বন্ধ করে দেবে। সরকার বাহাদুর নরম হল, ঠিক আছে, টঙ্কর জমি জরিপ করে দেখা হবে, কার আছে কত জমি, তা দিয়ে হিসেব হবে, কার ভাগে কত ধান। কত ধান দিতে হবে। জমির পরিমাণেই তো ধানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

জরিপে চাষাদের লাভ হয়, রাজা-জমিদারের আমিনি কেরামতিতে আড়াই বিঘাকে তিন বিঘা দেখানো হয়েছিল কোথাও, কোথাও দেড় বিঘাকে তিন বিঘা। আমিনের কাজই এই। না হলে আমিনিকে ভয় করবে কেন জমির চাষা? হ্যাঁ, আমিনকে কে না ভয় করত? আমিন ধরাকে সরা জ্ঞানে মেপে দিতে পারে জমি। তাই দিয়েছিল। এখন মণি সিং জোট করেছে। জোতের মানুষ আমিনের চেন ধরেছে। এক চেন মানে ৬৬ ফুট। তা জানত কে? আমিন বলত এক চেন মানে ৮০ ফুট। তাতে ছোট জমির মাপ বড় হয়ে যেত। আড়াই বিঘে হতো তিন বিঘের উপর। ফলে টঙ্কের পরিমাণ বেড়ে যেত। ললিতবাবু মাপ জানেন। তিনি তদারকি করায় রাজার আমিন আর ঠকাতে পারল না। আমিনের কেরামতি শেষ। চেন ঝাড়া দিয়ে জমিতে ফেলেছে। কম হবে না, বেশিও হবে না। জরিপের পর নরম ফরমান এল সরকার বাহাদুরের, টঙ্ক দেবে আট কিস্তিতে। আট কিস্তিতে শোধ হলে জমিন চাষার হয়ে যাবে। রায়তি স্বত্ব পাবে চাষা। পাঁচ দফার দ্বিতীয় দফা মানা হতে পারে এই ভাবে। একে মহাযুদ্ধ, তারপর কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল, চাষারা সব চুপ করে থাকল। টঙ্কের চাপ আপাতত কমল তো। কিন্তু টঙ্ক উঠে গেল না। চাষির মনে ক্ষোভ থেকেই গেল। মণি সিং জেলে গিয়েছে তাই টঙ্ক প্রথা চালু রয়েছে। ১৯৪২ সালে মণি সিং জেল থেকে মুক্তি পেলেন। কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হল। তখন কী হল?

মহা-মন্বন্তর এল দেশে। মিলিটারির জন্য ধান ক্রোক করতে লাগল সরকার। চাষার পেটে অন্ন নাই। ধান নিয়ে নিল মিলিটারি। চালের দাম মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেল। সুসঙ্গ দুর্গাপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ নিরন্ন মানুষের কান্নায় প্লাবিত হয়ে গেল। নিরন্ন হল মানুষ, বিবস্ত্র হল মানুষ, ধানের সঙ্গে কাপড়ের অভাব ঘটল। কত মানুষ মরে গেল না খেয়ে। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত গান বেঁধেছিলেন,

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে না রে আর/ সোনার পল্লী হলো যে আঁধার
নিশ্চিহ্ন হইল কত পরিবার/ গ্রামবাসী আজ অসহায়।।

॥ পাঁচ ॥

১৩৫০-এর মন্বন্তরের কথা লেখা আছে, আঁকা আছে, লেখায় রেখায় মন্বন্তর জেগে আছে মানুষের মনে। গৃহস্থের উঠানে উঠানে শ্মশান কবর, শৃগাল ঘোরে নির্ভয়ে। কিন্তু মন্বন্তরে যত মানুষ মরল, তার চেয়ে বেশি মানুষ বেঁচেও থাকল। সেই মানুষ বেঁচেছিল গারো পাহাড়ের দেশে, কংস নদী, সোমেশ্বরী (সিমসাং) নদী আর ধনু নদী, নাগরাই নদী, সোনাই নদীর কূলে, হাওরের ধারে। তারা সব মিছিল করে চলল নেত্রকোনা, ১৯৪৫-এর চৈত্রের ১৯-২০ তারিখ, ৪-৫ এপ্রিল। দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেলে আবার জোট বাঁধল মানুষ। বুঝল জোট না বাঁধলে অন্ন জুটবে না। চলো নেতের'কনা।

ওই দ্যাখো মায়ের পিঠা কচিডা বান্ধা থাকে।
তারে নিয়া মা বাপে শত মাইল হাঁটে।।
জনসমুদ্র লাগিসে জুয়ার, নেতেরক'না চলো।
টঙ্ক দিব না, ধান দিব না, সক্কল মিলা বলো।।
টঙ্ক প্রথা, না না না।
জমিন্দারি, না না না।।
ধান দিব না ধান দিব না।
কবির ভূমি নেতরক'না।।

বিপুল শুনতে শুনতে বলে, এই কথা কেউ জানে না।

অতীন বললেন, বিপ্লব কবিতার মতন, কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের কবিতা।

বিপুল বলল, আপনি সেই বৃত্তান্ত লিখছেন।

অতীন বলল, আমি নই, আর কেউ, যে এসে দিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডুলিপি।

কে এসে দিয়ে গিয়েছিল, কে জানে তার কথা। বিপুলের মনে হয়, এই পাণ্ডুলিপির কাহিনীটা অতীন সরকারের নিজের লেখা। অতীন সরকারের সাধ তিনি নিজেই অজ্ঞাতনামা সেই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখে এক রহস্য নির্মাণ করতে চাইছেন অতীন। অতীন ছাড়া কে লিখবে এই ইতিহাসের কথা?

অতীন বললেন, কেউ একজন আরম্ভ করে দিয়ে গেছেন, আমার কাজ যোগ করা।

হ্যাঁ, কিন্তু অন্য লোকের লেখা, সে তো অন্য লেখাই হবে, তার ভিতরে খবরিয়া বাণেশ্বর, সুবুদ্ধ, প্রবুদ্ধ কি থাকতে পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রকুমার খবরিয়ার কথা আপনি ছাড়া কে জানে?

অতীন বললেন, অজ্ঞাতনামার লেখাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ছিল দশ হাজার শ্লোক, হয়ে যাচ্ছে এক লক্ষ।

মহাভারতের কথা বলছেন, জয় কাব্য? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

অতীন বললেন, তাই, আমার কাজ আপডেট দিয়ে যাওয়া।

চুপ করে বসে থাকল বিপুল। রাত এখন অনেক। তাঁদের নৈশাহার হয়ে গেছে। বাইরে খুব শীত। এই বাড়িটি কাঠের। তাই ভিতরে ঠান্ডা কম। অতীন বললেন, চলুন ব্যালকনিতে যাই।

শালমুড়ি দিয়ে তাঁরা ব্যালকনির দরজা খুলতেই ধূসর এক অন্ধকারের মতো কুয়াশা আবৃত করে ফেলল তাদের। ব্যালকনি থেকে বাইরের রাস্তা, মাঠ, ঘরবাড়ি, মসজিদ, প্যাগোডা, মন্দির সব কুয়াশার ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তার আলোও মুছে গেছে। সুসঙ্গ দুর্গাপুর দেখা যাচ্ছে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অনন্ত কুয়াশা নেমেছে এই রাত্রে। এরই ভিতর মিলিয়ে গেছে সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধ, অন্তত অতীন যা লিখেছেন তা এমনই। আর এমন কুয়াশার ভিতর সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ। তাদের ঠাকুরদা। কুয়াশায় ব্যালকনি ঢেকে যেতে বিপুল বলল, ঘরে চলুন।

অদৃশ্য প্রায় অতীনের কণ্ঠস্বর শুনল বিপুল, এই কুয়াশা কাটতে দুদিন লাগবে।

কেন? বিপুল জিজ্ঞেস করল।

এই পাহাড়ি দেশে কুয়াশা এলে এমনই আসে, সারাদিন রোদ ওঠে না, দুহাত দূরের কিছুই দেখা যায় না, অন্ধের মতো হয়ে যায় মানুষ, সাড়া দিয়ে দিয়ে পথ চলে।

হয়তো আগামীকাল দুপুরের দিকে রোদ উঠবে। বলল বিপুল।

না, আমি টের পাই মশায়, এখন ক'দিন আমরা ফিরতে পারব না। বললেন অতীন, এই কুয়াশা প্রাচীন কুয়াশা, হিমানি পর্বত থেকে যাত্রা করেছিল একদা, বনের ভিতরে পায়ে চলার পথ ধরে ধরে এদিকে এসেছিল সেই কবে! এর কোনও শেষ নেই মনে হয়, এতদিন অবরুদ্ধ ছিল কোথাও, কোনও গুহায় হতে পারে, বনের ভিতর হতে পারে, কোনও জলাভূমির ভিতরে হতে পারে, এখন ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছে, সমস্ত রাত ধরে আসবে।

অতীনকে আবছা দেখতে পাচ্ছিল বিপুল। ব্যালকনির আলো কুয়াশায় ঢেকে গেছে। সে বলল, আপনি কুয়াশা চেনেন?

চিনি, আমি একবার, সে অনেক বছর আগে, তখন আমার বয়স বছর কুড়ি, পাকিস্তান ভাঙছে, বাংলাদেশ জন্ম নিচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ শেষের মুখে প্রায়, অঘ্রান মাস, নেত্রকোনায় খান সেনারা ঢুকছে নরহত্যা করতে, শেষ কামড় দেবে তারা, শুনলাম মিলিটারি আসছে নেত্রকোনায়, আমরা সবাই এই সুসঙ্গ চলে এসেছিলাম মিলিটারির ভয়ে, তখন এক নাগাড়ে গণহত্যা চলছিল, সেই সময় একদিন সকালে কী মনে হল, আমি বেরলাম গারো পাহাড়ের দিকে ঘুরতে। ওদিকে একটা গ্রাম আছে, সেখানে নাকি গারো রাজার একটা গড় আছে। দুর্গ। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজা সোমেশ্বর পাঠক এই পাহাড়তলি জয় করার আগে তো গারোদের রাজত্ব ছিল এই অঞ্চল। আমি শুনেছিলাম, সেই দুর্গে গারো রাজা থাকেন নাকি একা। ৭০০ বছর বেঁচে আছেন গারো রাজা। কথাটা যে সত্যি না, তা বুঝতে পারা যায়। এই রকম কত কথা বন-পাহাড়ের দেশে ঘোরে, মানুষ নিজের মতো করে বানিয়ে নেয়। যাই হোক, দুর্গ তো থাকতেই পারে। সেই দুর্গ নাকি পাহাড়ি বনের ভিতরে রয়ে গেছে। সেই দুর্গে রাজা বা রাজার বংশধর থাকেন। কথাটা শোনা যায়, কিন্তু কেউ স্পষ্ট বলতে পারল না। আমি অধিকন্তু শুনলাম হস্তী প্রহরায় একা থাকেন দুর্গাধিপতি। সেই গারো রাজার নাকি মরণ হয়নি। তিনি আবার হস্তী সৈন্য নিয়ে নেমে আসবেন নিজ ভূমি পুনরুদ্ধারে। সেই ভূমি সিমসাং নদীর ধারের সুসঙ্গ দুর্গাপুর।

বিপুল বলল, এমন রাজার কথা বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসে আছে।

জানি, কিন্তু পরাজিত গারোজাতি এই বিশ্বাস করে, শুধু রাজা আছেন, আর কেউ না, রানিও না, রাজকন্যাও না, এখেনে সেই রাজার কথা আছে যিনি তাঁর হারানো দেশ ফিরে পেতে শত শত বছর বেঁচে আছেন, বন পাহাড়ে দুর্গের ভিতরে থাকেন, আসবেন আসবেন, দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবেন।

মানুষ কত কল্পনা করতে পারে! বিপুল মন্তব্য করে।

কল্পনা নয়, পরাজিত মানুষের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। হৃত দেশ উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা। অতীন বললেন, পাহাড়টা কত কাছে, অথচ যাইনি, পাহাড় আমাকে ক'দিন ধরে টানছিল, গারো রাজা টানছিল, পাহাড়ের পথ জানেন তো, পাকদণ্ডী, ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়ে জঙ্গলের ভিতরে হারিয়ে যায়, এক পথ থেকে আর এক পথ বের হয়। আবার কোনও পথ নীচেও নেমে যায় কোনও একটা জায়গা থেকে, আমাকে যেন ভুলোয় পেয়েছিল, পাহাড় আমাকে ডাকছিল। আমি চলছিলাম। গোধূলি আলোর মতো কুয়াশার ভিতরে আমি দেখতে পেলাম সমুখে অনেক দূরে ছায়ার মতো একটা মানুষ যায় যেন। ওই যে বলেছিল কে, রাজার লোক থাকে পাহাড়ে, সে হতে পারে। আমি ভাবলাম ডাকি, গারো রাজার বাড়ি কোথায় তা জিজ্ঞেস করি, কিন্তু চতুর্দিক এত নিস্তব্ধ, পত্র মর্মর ব্যতীত আর কোনও শব্দ নেই, আমি তাকে ডাকতে পারলাম না। কিন্তু মনে হলও সেও রাজার বাড়ি যাচ্ছে। দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ। মাথার চুল ঘাড়ের কাছে লুটোচ্ছে। আমি দূর থেকে তার পিছু ধরলাম।

বিপুল মানুষটাকে আবছা দেখতে পাচ্ছিল এত সময়, এবার কথা বলতে বলতে মুছে যেতে লাগলেন অতীন সরকার। বিপুলের ভয় করল। কুয়াশার এমন নিশ্ছিদ্র আবরণ সে দ্যাখেনি। মনে হল কথা বলতে বলতে হারিয়ে যাবেন অতীন, যেমন তিনি লিখেছেন সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধর কথা। বা যেমন তারা দেখেছে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধর কুয়াশায় মিলিয়ে যাওয়ার কথা। তাই বলছেন অতীন, পাহাড়ে গিয়ে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন হঠাৎ আসা কুয়াশার ভিতর। তারপর সেই কুয়াশার ভিতরে কুয়াশাচ্ছন্ন এক মানুষ... বলতে বলতে থামলেন অতীন। চুপ করে থাকলেন। বিপুল টের পেল আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। ভিজে যাচ্ছে গায়ের আলোয়ান। সে বলল, ভিতরে চলুন, শুনব, বাইরে থাকা যাচ্ছে না।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই ঘটনা, সেই দৃশ্য। বিড়বিড় করে বললেন অতীন।

আপনার চোখ দিয়ে আমিও। বলল বিপুল।

হুঁ, আমার হাত ধরেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন অতীন। বিপুল আন্দাজে হাত বাড়ায়। কিন্তু স্পর্শ করতে পারল না অতীনকে। অতীন বললেন, আপনি ভুল দিকে হাত বাড়িয়েছেন মশায়।

তবে? কথার মুখে হাত বাড়ায় আবার সে। কিন্তু খুঁজে পায় না অতীনকে। অতটুকু ব্যালকনি, লোকটা গেল কোথায়? দু'ফুট দূরের মানুষও দেখা যাচ্ছে না। অতীন বললেন, ঘরে যান, আমিও ঘরে যাব, আমার ভয় করছে মশায়।

বিপুল আন্দাজ করে ঘরের বন্ধ দরজার দিকে ফিরল। দরজা স্পর্শ করে ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখল বিছানায় বসে আছেন অতীন। গায়ে টেনে নিয়েছেন কম্বল। বললেন, চোখ জড়িয়ে আসছিল, বাইরে খুব কুয়াশা পড়ল নাকি?

সেই কুয়াশা আরও ঘন, কিন্তু আপনি তো...?

বিপুল চুপ করে গেল। সমস্তটা কেমন বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা ভেদ করে যাচ্ছে। অতীন আবার বললেন, এই কুয়াশা অনেক প্রাচীন, কোনও গুহা-কন্দরে লুকিয়েছিল বহু বছর বাদে উঠে এসেছে।

কুয়াশার কথা হচ্ছিল। অনেক সময় ধরে কুয়াশা ব্যাপ্ত হচ্ছিল। কুয়াশার কথা বলতে বলতে থামলেন অতীন, তারপর জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন, আমি কি একই কথা বলে যাচ্ছি?

আপনি কি কিছু ভুলে যাচ্ছেন? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

কেন বলুন দেখি, মনে হচ্ছে তাই? অতীন জিজ্ঞেস করলেন।

কুয়াশায় কিছু দৃশ্য কি ঢেকে যাচ্ছে?

ঢেকে যাচ্ছে সব। বিনবিন করে বললেন অতীন, কুয়াশা যেন স্মৃতির ভিতরে প্রবেশ করেছে, মুছে দিচ্ছে সব, অনেক বছর বাদে সেই কুয়াশা ফিরে এল আজ, জানি না কেন?

বিপুল বলল, উত্তরাঞ্চলে এমন কুয়াশা স্বাভাবিক, আমি কিছুদিন আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে ছিলাম, সেখানে রোদই ওঠে না শীতের সময় দিনের পর দিন।

মাথা নাড়েন অতীন, বলেন, সে তো হয়, নেত্রকোনাতেও হয়, কিন্তু সেই কুয়াশার কথা ভাবুন, সে বছর নাকি কুয়াশা দু'দিনের জন্য পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল সুসঙ্গয়, ভেসে গিয়েছিল নেত্রকোনার দিকে, ফলে আর্মি ঢুকতেই পারেনি, শহরের কাছে এসে ফিরে গিয়েছিল ভয় পেয়ে, অমনি কুয়াশা কেউ কখনও দেখেনি।

বিপুল জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি পাহাড়ে?

অতীন বললেন, আমি সেই কুয়াশার জন্ম দেখেছি মশায়, সেদিন রোদ ছিল না বটে, কিন্তু আলো ছিল, সব দিক দেখা যাচ্ছিল, আমি একা একা রওনা হয়েছি, পাহাড়ি পথে চলেছি, আমার ইচ্ছে গারো রাজার দুর্গ দেখব, পাহাড়ে পৌঁছবার আগে পথে এক বুড়ার সঙ্গে দেখা, সে বলল, আমার যদি ইচ্ছে হয়, আমি নিজেই পথ খুঁজে পাব, পাহাড়ে রাজার বাড়ির পথ সব, কেউ না কেউ এসে নিয়ে যাবে, কিংবা নিজেই চিনে নিতে পারব আমি, আমি পাহাড়ি পথ ধরে পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করেছি, কিন্তু কেউ ছিল না, বনের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

কেমন ছিল সেই পথ? পাথর আর মাটির সেই পথ ঘুরে ঘুরে অনেক উপরে উঠে গেছে। গাছের পরে গাছ। শাল, সেগুন, মহুয়া, গজারী, আকাশমণি, বাঁশ, বেত। শাল, সেগুন, মহুয়ার নিষ্পত্র হওয়া আরম্ভ তখন। অনেক পাতা আছে অনেক পাতা নেই। পাতা ঝরছে, ঝরেই যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অনেক দূর। পাহাড়ে পাখির ডাক ছিল। পাতা ঝরার শব্দ ছিল। অঘ্রানের শীত ছিল ঝিমঝিমে। অতীন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বনে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম, তাই। কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছিল, কোন পথে যাবেন বুঝতে পারছিলেন না। একটা জলাশয় পড়ল পথে। হ্রদ। সেই হ্রদে প্রচুর পদ্ম ফুটেছিল। অতীন একটি পদ্ম সংগ্রহ করলেন। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। পঁচাত্তর বছর আগে গারো পাহাড়ে ভূমিকম্প হয়েছিল তা জানা ছিল তাঁর। সেই ভূমিকম্পে একটা পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে হ্রদের জন্ম দিয়েছিল। সেই রেবরং লেকের কাছে এসে পৌঁছলেন নাকি? আবার হাঁটা শুরু করলেন। জনমনিষ্যি নেই। কাঠুরেরা নেই যে পথ জিজ্ঞেস করে নেবেন। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা বেড়ে যাচ্ছিল। অত উপরে পাখিরা ছিল না, পাখির ডাকও না। তখন তিনি টের পেলেন অনেক উপরে উঠে এসেছেন। সেই সময় অবাক হয়ে দেখতে পান সামনে কুয়াশা জমে আছে। বনের ভিতর থেকে কুয়াশা যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কুয়াশার রং মেঘের মতো। মেঘের রং হাতির মতো। কুয়াশা ছেয়ে ফেলতে লাগল বন। এতটা সময় সব দিক ছিল স্পষ্ট। এবার সব অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল। তাঁকে ঢেকে ফেলল কুয়াশা। কুয়াশায় না প্রবেশ করে তাঁর উপায় ছিল না। কুয়াশার ভিতরে হাঁটতে লাগলেন তিনি অন্ধের মতো প্রায়। কত সময় হেঁটেছেন হিসেব নেই। তারপর আচমকা কুয়াশা নেই। স্তিমিত আলোয় দেখা গেল এক দুর্গ।

॥ ছয় ॥

গারো রাজার দুর্গ এক অতি বৃহৎ প্রাসাদ, কুয়াশার প্রাসাদ যেন বা। লম্বায় অনেক। মনে হল এক অতিকায় মানুষ দুদিকে দীর্ঘ দু-হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষের মুখ দুর্গের মুখ। সেই মুখে ঝিম ধরা নীরবতা। অতীন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কুয়াশা ছিল না, আলো ছিল গোধূলিবেলার মতো। ছায়া ছায়া আলো বনের বাইরে বিস্তৃত। বন আছে দুর্গের পিছনে। বন আছে অনেকটা দূরে। বন যেন দুর্গটিকে ঘিরে ছিল। অতীন ঘুরে তাকালেন অনেক দূরে, যে পথে এসেছেন তিনি। মনে হল সেই পথে আবার ফিরে যান। আবার মনে হল ফিরে যাওয়া মানে এই আসা আর আসা হল না। তিনি আকাশে তাকালেন। নীল, কত নীল তা তিনি বর্ণনা করতে পারবেন না। অতীন বুঝতে পারলেন, গারো রাজার দুর্গে এসেছেন তিনি। প্রবেশ করতে হবে।

দুর্গ, হ্যাঁ, দুর্গ। আমি এক দুর্গের সমুখে দাঁড়িয়েছিলাম। যদি পাথর আর কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে তবে সেই দুর্গের গড়ন ছিল পুবদেশের প্যাগোডার মতো। কাঠের লম্বা বারান্দা। কাঠের কারুকাজ তাকিয়ে দেখার মতো। লতাপাতা, সাপ, ড্রাগন, মেঘের স্তূপ, কত রকম অলঙ্করণ ছিল। রাজার বাড়ির জানালা দরজা খোলা ছিল। কিংবা কুয়াশা ভেদ করে ভিতর দেখা যাচ্ছিল। কী দেখা যাচ্ছিল, এক অপরিসীম শূন্যতা যেন। আমি সম্মোহিতের মতো প্রবেশ করলাম ধূসর দরজা দিয়ে। এখন মনে হয়, কুয়াশার ভিতর লুকিয়ে থাকে যে বাড়ি, তার দরজাও ছিল কুয়াশার পর্দা। তখন সেই পর্দা সরে গেছে। বুঝতে পারলাম কুয়াশার ধূসরতা ছিল দুর্গের প্রাচীর। লম্বা এক পথ ছিল আমার সমুখে। সেই পথ আমাকে নিয়ে গেল রাজ দরবারে। দরবার খুব সাধারণ। একটি শূন্য আসন ব্যতীত ঘরে কিছুই ছিল না বলতে গেলে। সেই শূন্যতার ভিতর অতিবৃদ্ধ এক গারো পুরুষ বসেছিলেন লম্বা কুশনে। তাঁর দিকে তাকালে মনে হয় ঘর নেই, প্রাসাদ নেই। আছেন তিনি পরম শূন্যতায় আসন নিয়ে।

একটি শূন্য আসন ব্যতীত ঘরে কিছুই ছিল না বলতে গেলে। আরও বলা যায় শূন্যতা ব্যতীত সেই ঘরে কিছুই ছিল না। মনে হচ্ছিল মহাশূন্যের ভিতরে প্রবেশ করেছি। প্রাসাদ আসলে নেই। মাথার উপরে কুয়াশার যে ছাদ, তার উপরে আকাশমণ্ডল। চারপাশের দেওয়াল তো কুয়াশার আবরণ। সেই মহাশূন্যতার ভিতর অতিবৃদ্ধ এক গারো পুরুষবসে ছিলেন লম্বা কুশনে। তাঁর দিকে তাকালেও মনে হয় ঘর নেই, প্রাসাদ নেই, আছেন তিনি পরম শূন্যতায় একা একা। তিনি কেমন? অনতিউচ্চ এক বৃদ্ধ যাঁর কপাল অজস্র বলিরেখায় ভরা। বৃদ্ধ গাছের গায়ে যেমন বয়সের চিহ্ন ফোটে রেখায় রেখায়, তেমনি। তাঁর গায়ে ছিল লাল, নীল, রঙিন আলোয়ান। পরনেও ছিল নীল পোশাক। মাথায় ছিল পাতার মুকুট। মুখখানিতে হাসি। আমার মনে হল মানুষ নয়, এক বহুবর্ণ ফুল-পাতায় ভরা অচেনা বৃক্ষ। তিনি আমাকে দেখে অবাক, বললেন, আমি ত আসিতে কহি নাই, তুমি কে, এখেনে কাউর তো আসার কথা ছিল না?

আমি বললাম, আমি যে শুনলাম রাজার ডাক এসেছে।

গারো রাজা, বৈশ্য গারো বললেন, যাই হক এসেছ, ভালো করিছ, তুমি আমার পজা?

আঁজ্ঞে, প্রজা।

কেনে এয়েছ?

খান সেনা আসতেছে, গণহত্যা হবে, সেই খবর করতে।

হারিয়ে যাবে কুয়াশায়। তিনি বললেন। হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। সেই হাসি আমি ইহজন্মে ভুলব না। চোখদুটি প্রস্ফুটিত সাদা আলোর দুই বিন্দু, যেন মহাশূন্যের দুই তারা, দুই তারা যেন চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে। আপনি ভাবুন একটি চোখ অন্য চোখের দিকে তাকিয়ে। এক চোখ অন্য চোখের দিকে চেয়ে হাসল। সেই হাসি তখন আমার গায়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল হিম কিংবা বৃষ্টির ফোঁটার মতো। তিনি হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে আসন নিতে বললেন। আমি একটি নিচু আসনে বসেছি। তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা সোমেশ্বর পাঠক সন্ধি করতে পাঠাল, আমি জানি একদিন কেউ আসবে সোমেশ্বর পাঠকের পরস্তাব নিয়ে, আমার শকতি সে বুঝতে পেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁজ্ঞে! আমি বুঝতে পারলাম না।

আমার হস্তীবাহিনী তখন প্রস্তুত ছিল না। বললেন গারো রাজা, হস্তীযূথ প্রস্তুত থাকলে সোমেশ্বর পাঠক পরাস্ত হয়ে ফিরে যেত কান্যকুব্জের পথে।

শোনা যায়, সোমেশ্বর পাঠক পরাস্ত করেছিলেন গারো রাজাকে।

তিনি হাসলেন, মৃদুস্বরে বললেন, আমার শকতির নিকট সে তুচ্ছ, আমি এখন বুঝি, এতকাল ধরে আমি রহি গিইছি এই স্থলে, একা, আমি একা, কেউ নেই কোথাও, শকতি কত থাকলে তা হতে পারে?

আমি ঝুঁকে বললাম, একা কেন, রাজা কি একা থাকে?

রাজা একা থাকে, রাজা পারে একা থাকতে, আমি রাজা বৈশ্য গারো, এই রাজার কেহ নাই, জন-মনিষ্যি নাই, রাজার তাতে ভয় নাই, রাজা জানে তার নিজের কত শক্তি, মহাশূন্যে একা থাকে গ্রহ-তারারা, একা থাকার শক্তি আছে বলে পারে, নইলে ভয়ে সব তারা আকাশ ছেড়ে পালাত, আকাশ অন্ধকার হয়ে যেত, তোমাদের ওই সোমেশ্বর পাঠকের লোকলস্কর লাগে, আমার লাগে না, আমি একাই এত শত বছর রয়ে গেছি, আমি গ্রহ আমিই তারা।

আঁজ্ঞে, রাজা সোমেশ্বর পাঠক তো বেঁচে নেই। আমি বললাম, বহু শত বছর আগে গত হয়েছেন।

নেই! প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন বৃদ্ধ, বিড়বিড় করতে লাগলেন, আমি রইসি, সে নাই, আহা, আমি সর্বত্যাগী রাজা বৈশ্য গারো, সোমেশ্বরেরে আমি দিয়েছি আমার সব, বন পাহাড়, খেতখামার লোকলস্কর, আমি ভগবান তাতারা রাবুগার আশীর্বাদ পেয়েছি, তিনি আমাদের বড় ঠাকুর, তাতারা রাবুগা বলেছেন তাই আমি রাজা বৈশ্য গারো, আমি আমার শোক নিবেদন করলাম, তাই-ই বলছি আমি। বলতে বলতে বৃদ্ধ রাজা তাঁর চীবরের মতো গাত্রবস্ত্র দিয়ে চোখ মুছলেন, আমি তো হিংসা করি নাই, আমি নিজেও মেনে নিয়েছিলাম সেই পরাজয় কিংবা সর্বস্ব ত্যাগ, সে দুর্গ অবধি না এসে নীচে নেমে গেল, হায় তার সঙ্গে আর দেখা হবে না?

আমি বললাম, সাতশো বছর আগে তিনি এদেশে এসেছিলেন।

সাতশো বছর! সেদিনের ব্যাপার, সে কার হাতে হত হয়েছে? গারো রাজা বৈশ্য গোয়েরা জিজ্ঞেস করলেন, পাকিস্তানি খান সেনা?

না, বহুদিন আগে ছিলেন তিনি, বহুদিন আগে চলে গেছেন। আমি বললাম।

তুমি তারে মরতে দেখেছ? গারো রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

না, আমি দেখব কী করে, আমার বয়ঃক্রম একবিংশতি মাত্তর।

তবে যে বললে সে মরে গেছে, মরিতে তুমি দেখ নাই?

আমি বললাম, এত দিন কেউ বাঁচে না।

আমি কি বাঁচি নাই, আমি কি মরে গিয়েছি? জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ রাজা। অতীন চুপ করে থাকলেন।

সোমেশ্বর পাঠক কি বাণপ্রস্থে গিয়েছেন, এই পাহাড়ের দিকে চলে এসেছেন? বৃদ্ধ রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

অতীন বললেন, তাঁর জানা নেই। বলতে বলতে মাথা নত করলেন। কেন না তিনি দেখছিলেন পরাস্ত রাজা বিজয়ী রাজার মৃত্যুসংবাদে শোকার্ত হয়েছেন। তাঁর ছিল মুণ্ডিত মস্তক। গাত্রবস্ত্র গভীর কালচে লাল, মুখমণ্ডলেও অজস্র বলিরেখা, চক্ষুমণি জ্বলজ্বল করছে জলের ভিতর ঝাঁকের মাছের মতো।

রাজা বললেন, হে সিমসাং নদী, আমার শোক লইয়া যাও।

অতীন মোহমুগ্ধের মতো বললেন, শোক গ্রহণ করতে আমার আসা।

হে বনর বাতাস, মোর দুঃখ নিয়া যাও। রাজা নিচু হয়ে বললেন।

অতীন বললেন, আমি সব কথা জানাব।

রাজা বললেন, আমি একা মান্দি (মানুষ), আমি কারে দিয়ে পাঠাব শোকবার্তা, হস্তীযূথে ডর লাগবে মান্দিগণের।

তিনি নেই। সোমেশ্বর পাঠকের কথা আবার স্মরণ করালেন অতীন।

শোকের কথা বলেছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস করি না, রাজা নেই আমার বিশ্বাস হয় না, সেই এক বসন্তকালে আয়ুব খানের শাসন তখন, সেনা এল, আমি হাতি পাঠায়ে সব শেষ করে দিলাম।

শুনতে শুনতে বিপুল জিজ্ঞেস করল, এসেছিল আয়ুবের সেনা?

অতীন বললেন, জানা নেই, কিন্তু গারো পাহাড় থেকে হাতিরা নেমে আসে আচমকা, তা শুনেছি, হাতি ধরা আর হাতি বেচা ছিল রাজাদের প্রধান আয়, হাজংদের পাহাড় থেকে নামিয়ে এনে বসত করানো সেই কারণে, তারা হাতি তাড়িয়ে এনে বন্দি করতে ছিল ওস্তাদ, সেই হাজংরা হাতি ধরবে না আর, এই বিদ্রোহ করেছিল, হাজং বিদ্রোহ টঙ্ক আন্দোলনের সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগের কথা, বলব পরে, আমার পাণ্ডুলিপিতে আছে সেই কাহিনী।

হাতি কোথায় থাকে, হাতির দেশ কোথায়?

হাতির নিজের দেশ চাটগাঁয়ের পুবে সেই বর্মা মুলুক পর্যন্ত, সে এক গহিন বন, মস্ত মস্ত গাছ আর বেত, বাঁশ আর ছনের নিবিড় বন। এ মুলুক সে মুলুক ছেড়ে গেলে আছে গহিন বন। মস্ত মস্ত গাছ সেই বনে, বেত, বাঁশ, ছন। অঘোর জঙ্গল সে, দিনেই থাকে রাত আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে জঙ্গল কত বড়! এক দিকে এক মুখে হেঁটে গেলে ছমাস লাগবে বন পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকতে। অঘ্রান থেকে বৈশাখ পার হয়ে যায় সে বনের ভিতর। লাখে লাখে হাতি থাকে সেই বনের দেশে। একসঙ্গে থাকে তারা, একই মুলুকে। সেই বনে হাতি ছাড়া আর কোনও জীবজন্তু থাকে না। তারা হাতির ভয়ে পালিয়েছে, না হয় হাতির পায়ের তলায় মরেছে। শূন্য শূন্য শূন্য সে হস্তীর মুলুক, আশমানে নাই পঙ্খি, পানিতে নাই মৎস্য। হাতির দল উপড়ে ফেলে বড় বড় গাছ। বৃক্ষ কাঁপে থরথর, হাতির রোষ পড়লে হল। হাজার হাজার মাইল যাও সেই বনে, কিনারা নাই কোনও। এমন বনে যাদের বাস, তারা যেন নব জলধর মেঘপুঞ্জের মতো বনের মাটিতে ভেসে ভেসে বেড়ায়। দলবদ্ধ হয়ে থাকে যারা, সেই মহাশক্তিধর হাতির দল থেকে ক'জনকে আলাদা বের করে আনা বড়ই কঠিন। সেই কাজ করতে মরত হাতিখেদার দল। কিন্তু তারা অসম সাহসী তাই ডরে না হাতিরে।

গারো রাজা বলেছিলেন যা, তা হল আয়ুবের সেনার খবর পেয়ে তিনিই হস্তীযূথ পাঠালেন সুসঙ্গ দুর্গাপুরে। রাজা বিশ্বাস করেন, সোমেশ্বর পাঠক জয় করলেও রাজ্য আসলে তাঁর। সোমেশ্বর পাঠক তাঁর অধীনেই রাজা হয়ে আছেন। তাঁর অধিকার সাময়িক। প্রজা পালনে তাঁর নিজের অধিকার। প্রজার ভালো মন্দে তিনিই তাদের দেখবেন। বিপদে রক্ষা করবেন। তিনি বললেন, খান সেনা আসার খবর তিনি পেয়েছিলেন বনের পঙ্খির কাছে। বনের পঙ্খিরা পাহাড় থেকে উড়ে যায়, খবর নিয়ে আসে। সেই এক পঙ্খি নাকি হলুদ পঙ্খি। হলুদ পঙ্খি খবর দিলে তিনি কুয়াশা নামিয়ে হস্তীসেনা পাঠিয়ে আয়ুবের সেনাদের পরাস্ত করেছিলেন।

আপনি কোনও নারীকে দেখেননি সেখানে? বিপুল জিজ্ঞেস করল।

অতীন বললেন, না তিনিই একা, আর কেউ ছিল না, এক আশ্চর্য গোধূলিবেলায় তিনি বসেছিলেন। জানালা ছিল সেই ঘরে। বড় বড় দুটি। কিন্তু মনে হচ্ছিল জানালা, দেওয়াল কিছুই নেই যেন, বাইরে ঘন কুয়াশা, কুয়াশার পারে কী ছিল তা দেখা যাচ্ছিল না। গারো রাজা বলছিলেন, আবার কুয়াশা নামিয়ে দিয়েছেন সুসঙ্গ থেকে পূর্ব ধলা, নেত্রকোনা পর্যন্ত, সমস্ত জায়গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেয়ে আছে নীরন্ধ্র কুয়াশায়, খান-সেনা বাহিনীর সাধ্য কি সেই কুয়াশা ভেদ করে তাঁর রাজত্বে প্রবেশ করে। সেনাবাহিনী ফিরে যাবে, ভয় নেই। হাত তুলে অভয় দিয়েছিলেন তিনি।

আজ কুয়াশা নামল কেন? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

হয়তো এমন কিছু ঘটত, ঘটতে যাচ্ছিল, ঘটতে পারল না। অতীন বিড়বিড় করলেন, বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে সুসঙ্গ দুর্গাপুর কিংবা এর মানুষজন।

আমার মনে হচ্ছে প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধ আসেনি, তাকে দ্যাখেনি গোপাল দাসও, সবই আপনার উপাখ্যানের কথা।

তারা তো পাণ্ডুলিপিতে আছে। বললেন অতীন, পাণ্ডুলিপি বলবে সব কথা। অতীন চুপ করে থাকলেন। বিপুল ভাবছিল পাণ্ডুলিপিই সত্য। অজ্ঞাতনামার পাণ্ডুলিপি ক্রমাগত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞাতনামা যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি কথা এসে প্রবেশ করছে। দশ হাজার হয়ে যাচ্ছে এক লক্ষ। বিপুলের মনে হয়, সে যা খুঁজতে এসেছিল তার অনেক বেশি পেয়ে গেছে যেন। আরও আছে। মানুষের অদম্যতার কাহিনী শেষ হয় না। কুয়াশার ভিতর থেকে তা ক্রমাগত বেরিয়ে আসতে থাকে। এই যে কুয়াশা, এর ফলে যে লোকটি ছুরি হাতে বেরিয়েছিল কারওর রক্ত দেখার নেশায়, যে ঘাতক ভেবেছিল শেষ করে দেবে নিরীহ পরিবারটিকে, যে শয়তান ভেবেছিল লুট করে আনবে যুবতীকে, সে কুয়াশায় ঘুরছে, পৌঁছতে পারছে না। ঘাতকেরা পথ হারিয়েছে। কত মৃত্যু দুয়ার থেকে ফিরে গেল। সেই মানুষটি একশো বছরের দিকে যাত্রা করল।

পরদিন কুয়াশা কাটল না। সূর্য ওঠেইনি যেন। কুয়াশায় নেত্রকোনা ফেরা যাবে না। দুপুরে রুমি, ঝুমি দুই বোন এল বেণি দুলিয়ে। তাদের বাবা আবার সাইকেলে রওনা দিয়েছে গারো পাহাড়ের দিকে। আশুথতলী খুঁজতে। আশুথতলী থেকে সুবুদ্ধ, প্রবুদ্ধকে ডেকে নিয়ে আসবে নাকি। তারা কত বারণ করেছিল, বাবা শোনেনি। বাবা হয়রান হয়ে ফিরে আসবে। আশুথতলা পাবে না, সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধকেও পাবে না।

রুমি বলল, বাবা লোকটার মাথায় ঘিলু নাই, হুঁসো মানুষ।

শুনে ঝুমি বলল, ছি, দিদি অমন বলতি নাই, বাবা সরল মানুষ।

রুমি হাত নাচিয়ে বলল, সরল হতি কে কইছিল, বাবারে যত সরল মনে হয় তত তিনি নয়, মিছে কথার উস্তাদ।

॥ সাত ॥

রুমি ঝুমি আজ সেজে এসেছে। সেদিন ছিল কান্নাভরা চোখ, গালে ছিল অশ্রুচিহ্ন। কপালে টিপ ছিল না। ময়লা, বাসি জামাকাপড়ে কপালে হাত দিয়ে বসেছিল। আজ তারা ঝলমল করছে। যেন এত শীত এত কুয়াশা, মেঘলা প্রকৃতির ভিতরে দুই বোন আচমকা ফুটে ওঠা রুপালি রৌদ্র। তারা যত সময় কুয়াশার ভিতরে ছিল, কুয়াশা যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের বয়স দীপ্তি ছড়াতে ছড়াতে কুয়াশা ভেদ করেছে। তারা এসেছে গান গাইতে গাইতে। তোমরা ভুলে গেছ মল্লিকাদির নাম... ফরিদা পারভিন গেয়েছিলেন কতকাল আগে গাঁয়ের এক মেয়েকে নিয়ে, যার বিয়ে হয়েছে দূর গাঁয়ে, যাকে ভুলে গেছে তার বাপের বাড়ির গাঁয়ের খেলার সাথীরা। কিন্তু এই কুয়াশার ভিতর গোপাল দাস গেল কেন অতদূর? পথ হারিয়ে যাবে না?

রুমি বলল, যাবে তো, পথ চিনতা পারবেনি, ঘুরে ঘুরে চোখের পানি ফেলবে।

বিপুল বলল, তাহলে, তোমরা আটকাতে পারলে না?

রুমি বলল, না, পারলাম না, বাবা খুব গোঁয়ার লোক, বলল যাবে, তো যাবেই, বুঝে না সব ভালো করে।

না দিদি না, বাবা অতি সরল মানুষ। ঝুমি বলল, বাবা সব বোঝে, কিন্তু নিজের মতো করে বোঝে।

ফের ওই কথা বলিস, বাবার মাথায় সব সময় ফন্দি ঘোরে, কথা বানায়। রুমি হাত নেড়ে নেড়ে বলল।

ঝুমি জিজ্ঞেস করল, কী যে বলিস দিদি, বাবা গুরুজন, বাবা সরল না তো কী, বাবা কি প্যাঁচালো মানুষ?

রুমি বেণির ফুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, বাবা কী তা বলা যাবে না, বাবা চায় আমরা দুই ভবঘুরের প্রেমে পড়ি, অথচ তারা কারা তার ঠিক নাই, তাদের গাঁ খুঁজে পাওয়া যায় না, তারা ভুস করে ডুব দেয় তো আর ওঠে না, তাদের দেখেছি বলা যায় না, কুয়াশার ভিতরে লুকোয় থাকা মানুষ।

দুই বোনের অদ্ভুত আলাপে মুগ্ধ হচ্ছিল বিপুল। অচেনা দুই যুবক, সুবুদ্ধ, প্রবুদ্ধর সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া বেঁধে দিতে চায় গোপাল দাস। কিন্তু রুমি বলল, সে চায় না, তারা কারা যে সম্পক্কো পাতাতে হবে?

ঝুমি বলল, তার কোনও মত নেই, কিন্তু দুই ভাইয়ের কোনজন তার পছন্দ তা সে ঠিক করতে পারেনি, নাম শুনেছে দুইজনের, কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখা হয়নি, তারা দেখা দেয়নি।

রুমি বলল, তোর কথা আমি বুঝতে পারিনে, তোর কিছু হয়েছে।

কী জানি, আমার কইতে সরম লাগে, মনে হয় সুবুদ্ধ কিংবা প্রবুদ্ধ আমারে ভালোবাসিয়াছিল। ঝুমি মুখ নিচু করে বলল।

তুই অদ্ভুত মেয়ে, কবে ভালোবাসিয়াছিল, কে ভালোবাসিয়াছিল রে, দুজনাই? রুমি কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, দু'জনার ভালোবাসা, হায়রে।

না, একজনা, জোছনা রাতে, আমি তারে বললাম, আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।

আহা রে, এইটা মা গাইত জানি, মা একা গাইত, তখন বিকেল শেষ হয়ে যেত, মনে নেই তোর?

মাথা নাড়ে ঝুমি, বিড়বিড় করে বলে, আজ হতে তুমি হৃদয়ের রাজা, তোমারে আমি করিব গো পূজা...।

আহা রে, তোর জন্যিই সে ফিরে আসবে ঠিক, কিন্তু না তাকিয়ে আবার ডুব দেবে, ফের ধাক্কা খাবি, তুই শুধুই প্রেমে পড়িস, তোর প্রেমের ফুল কবে যে ফুটবে! রুমি হাত নাচিয়ে বলল।

সে তো তোমাদের বাসায় আসত। বললেন অতীন।

মিছে কথা বলেছি। রুমি বলে।

জ্যোৎস্নারাতে তোমাদের হাজং বিদ্রোহ, হাতিখেদা বিদ্রোহের কথা শুনিয়েছিল জানি। অতীন অবাক হয়ে বললেন।

একদম মিছে কথা। রুমি বলল, তাই না ঝুমি?

ঝুমি মাথা নেড়ে বলল, আমার মনে হয় জোছনা রাতে আমি গান গেয়েছিলাম, আর তারা শুনিয়েছিল, হাজং জাতির হাতিখেদা বিদ্রোহ।

রুমি বলল, বলে নাই, তবু বলছিস বলেছিল?

কে বলল বলে নাই, বিদ্রোহ কি হয় নাই? ঝুমি হাত নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করে।

সেডা হয়েছিল, কিন্তু তার কথা দুজনের কেহই বলে নাই। রুমি বলল।

ঝুমি বলল, তাহলে হাজং বিদ্রোহের কথা বলল কে?

রুমি বলল, বই পড়েছি, তুই পড়েছিস, আমিও।

কমলা সায়র যখন হয়, তখনকার কথা কে বলল দিদি?

কে আবার, মা বলত, সায়র কাটা হচ্ছে, জল ওঠে না, শুধু অন্ধকার, তখন রানি নামল অন্ধকার জলশূন্য দিঘিতে, দিঘি না, গর্ত, হাঁ-মুখ, কবর কাটা হয়েছিল যেন।

আচ্ছা থাক, মা এসব বলেছিল বলে মনে নেই আমার। ঝুমি বলে।

তাহলে কে বলেছিল?

মনে হয় আর কেউ, তারা সুবুদ্ধ না প্রবুদ্ধ? ঝুমি জিজ্ঞেস করে।

রুমি বলল, তোর খোয়াব কাটছে না, তারা কারা যে বলবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বলতে বলতে ঘুম পাড়াত, বাবা সেদিন বাসায় থাকত না, বাবা যেত মাসির বাড়ি। রুমি বলে।

ঝুমি বলল, মিছে কথা, আমার মনে হয় জ্যোৎস্নারাতে তারা দুইজনা বলেছিল, তারা কমলা সায়র দিঘি খনন দেখেছিল।

হাসে রুমি, তোর মাথায় গোবর, সে-কি আজকের কথা!

অতীন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন, আবার দুই বোনের ভিতর গোলমাল না লাগে, কুয়াশা যে কাটেনি, জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যে রাত জেগে পিঠা করলে, কেন করলে?

রুমি বলল, এমনি করেছি, বাবা ভাবল তাদের জন্যি করেছি, আচ্ছা স্যার তারা কি এয়েছিল সত্যি?

এ কেমন কথা! রুমি বলছে, তার বাবাকে ফাঁকি দিতেই পিঠা করা রাত জেগে। তারা যে আসতে পারে না, তা জানত তারা। অভিনয় করে বাবাকে ফাঁকি দিয়েছে তারা। কিন্তু রুমির কথার ব্যাখ্যা কী? রুমি বলল, বাবা বলত দুই ভাই আসবে, এল বলে, কিন্তু আসেনি তো। বাবা বলেছিল, তাদের জন্য পিঠা বানাতে। তারা বানিয়েছিল। তারা আসেনি বলে, চোখের জল ফেলে বাবাকে বুঝিয়েছিল, খুব কষ্ট পেয়েছে। তাতে বাবা খুশি হয়েছিল। বাবার জন্য রুমির কষ্টও হয়। মাকে বাঁচাতে পারল না, হাগল-পাগল মানুষ, সবাই ঠকায়।

কিন্তু এই ব্যাপার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বিপুল বলল।

বাবা চেয়েছিল আমরা তাদের প্রেমে পড়ি, তাই খুশি হয়েছিল, চিনিই না তো প্রেমে পড়ি কী করে?

কিন্তু তারা তোমাদের বাড়িতে আসত, দেখা হতো তো? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

নো স্যার, নো, মিছে কথা, আমরা সোমত্ত হয়েছি, বাইরের পুরুষ কেন আমাদের বাসায় আসবে? রুমি বলল, বাবা একবার বলেছিল, তারা ক'দিন থাকবে, আমি বলেছিলাম, মাছের ঝোল, সব্জি আর ডালে ভর্তায় লবণ ঢেলে দেব, ভাত পুড়ায়ে দেব, দুধে জল মিশায়ে দেব।

ইস, পারতে তা? অতীন বললেন।

খুব পারতাম স্যার, রাগ হলে এক একদিন বাবার মাছের ঝোলে এক মুঠো নুন ফেলে দিই। রুমি বলতে বলতে ওড়নার কোণ পাকাতে লাগল, তারা কারা স্যার?

অতীন বললেন, কেউ না।

রুমি বলল, আমিও তাই ভেবেছি, কেউ না, হাটের মানুষ যেমন হয়, কেউ কিন্তু কেউ না, তেমনি।

আমি তা মানি না, তারা আসেনি কেন না তুই চাসনি, বাবার কথায় তুই সায় দিসনি, তাই। ঝুমি বলল।

বাবা ভুল করত তাদের থাকতে দিলে, আমরা বড় হয়েছি, বাবা তা বোঝে না? নিন্দা হতো সমাজে।

কিন্তু, আমরা ভালো হলে, তারা থাকলেই বা কী হতো? ঝুমি বলল।

ভালোমন্দর কী আছে, আমাদের মা নেই, তাদের চিনি না, কেন থাকবে? রুমি বলে।

আমি চাইতাম তারা আসুক।

ঝুমির কথায় রুমি বলল, তোর খুব টান যে, তোরে বিবাহ দিতে বলব বাবারে, পুরুষ দরকার তোর।

তাহলে সত্যিই তারা তোমাদের বাসায় আসেনি কোনওদিন? জিজ্ঞেস করে বিস্মিত বিপুল।

না স্যার, বাবার খুব ইচ্ছে ছিল তারা যেন আসে, আমাদের সঙ্গে প্রণয় হোক, কিন্তু আমি বলেছিলাম তারা এলে দোর খুলব না, গায়ে গোবর-জল ঢেলে দেব, শুকনা মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দেব, সে কেমন হতো?

ঝুমি বলল, দিদি, বাবার কত কষ্ট হতো তাতে।

রুমি বলল, বাবার না, তোর কষ্ট হতো, আমাদের কথা কেউ ভাবে না, আমরাও ভাবব না।

ওরা যদি আসে আবার? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

থাকলে তো আসবে স্যার, কুয়াশা হয়ে গেছে তারা। বলে রুমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। জানালায় কাচের ফ্রেম। কাচের ভিতর দিয়ে কী দেখে রুমি? সোমেশ্বরী নদী, নাকি গারো পাহাড়, সেই আশুথতলী গ্রাম। রাজার দুর্গ, পদ্মদিঘি? রুমির মুখখানি উদাসীন। সেই উদাসীনতা যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা গারো পাহাড়, সোমেশ্বরী নদী, পদ্মদিঘি, গারো রাজার প্রাসাদের উদাসীনতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। রুমি কি প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, নাকি প্রেম চায় সে, কিন্তু বলতে না পেরে বিরুদ্ধে বলে? ও কারো কথা মনে করছে কি, ও কি কল্পনা করতে চাইছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন ছিল প্রবুদ্ধ। আহা,

তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া।
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া।।
বাড়ির আগে ফুট্যা আছে মালতী-বকুল।
আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল।। ★

নয়নচাঁদ ঘোষের পালার চন্দ্রাবতী বসে আছে ম্লান মুখে। থাক প্রবুদ্ধ সুবুদ্ধর কথা, এতে শুধু দুই কন্যার বিবাদ হবে, আবার মন খারাপ হবে। বিবাদে ভয় ধরে গেছে বিপুল আর অতীনের, বিবাদে এরা দুজনে যদি মুছে যায়? আর এত বিবাদই বা হবে কেন? বিপুল বলল, তোমরা একজনেরটা আর একজন মেনে নাও।

কারটা কে মেনে নেবে স্যার? ঝুমি বলল।

কেন, আমি বড়, আমারটা তুই স্বীকার করে নে।

তোমার কোন কথা স্বীকার করে নেব দিদি?

এই যে বলছিস, জোছনারাতে গান, তারা এসেছিল, প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ, তারা আসেনি তো।

ঝুমি গুনগুন করে, এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।

রুমি বলল, তাদের আমরা দেখিনি, এইটা স্বীকার করে নে।

ঝুমি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তা হয় না, মিছে কথা আমি বলতে পারব না।

রুমি বলল, মিছে কথা না, সত্যি কথা, তোর আর বাবার মিলিত মিছে কথা, তারা আসেনি।

ঝুমি দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় জানালার দিকে। নিজের মনে বলতে থাকে কী কথা! আশ্চর্য কথা। একদিন, সেদিন আচমকা শীত চলে গিয়ে বসন্ত এল। একদিনের জন্য কুয়াশা এল না, কোকিল ডাকল, এই সেদিন। গারো পাহাড়ের গাছের পাতা ঝরতে লাগল। কত রকম ফুল ফুটল সব দিকে। শিমুল, পলাশ, মান্দার, অশোক, নিম ফুল, নীল ফুল লাল ফুল, হলুদ ফুল, আমের মঞ্জরী।

ইস, কী সব বলছে, বুঝুন স্যার, আমার বুনের মাথা নষ্ট করে দিয়েছে বাবা আর সেই দুজন। রুমি হাত নেড়ে বলে, শীতই কাটে না, কুয়াশাই কাটে না, আর উনি বলছেন, বসন্ত এসে গেছে।

ঝুমি তখন রুমির কথায় পাত্তাই দেয় না। বলছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, শীত নেই, দখিনা বাতাস বইছে সোমেশ্বরীর দিক থেকে, আহা সে কী সুমধুর বাতাস, তখন দুজনের দুজনই একজন নীল পাগড়ি, অন্যজন হলুদ পাগড়ি মাথায় দিয়ে, নীল জামা গোলাপি জামা গায়ে দিয়ে সাইকেল টিং টিং করতে করতে সেই গারো পাহাড়ের দিক থেকে আসছে আমাদের সুসঙ্গের দিকে।

এ কি সত্য? অতীন জিজ্ঞেস করলেন।

আমারও এখন তাই মনে হয় স্যার, এ কি সত্য, সকলি সত্য! সত্য স্যার।

বিপুল জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হল?

ঝুমি হাসল, আমি ভাবি, এ কেমন হল, আচমকা বসন্ত এসে গেল, গান গেয়ে উঠল কে যেন, আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে, ও পলাশ ও শিমুল, মনে আছে স্যার, ইন্ডিয়ার লতাজির গান, আমার মা খুব গাইত, মনে আছে দিদি তোর?

রুমি যেন নিজেকে মচকাল কিন্তু ভাঙল না, বলল, এই গান না অন্য গান।

অন্য গান না, এই গান।

রুমি মাথা দুলিয়ে বলল, সবই মিছে কথা, মা গাইত নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়।

ঝুমি তার দিদির কথায় কোনও মন্তব্য করল না। তার কথা বলে যেতে থাকে। কী কথা। সেই যে নীল হলুদ গোলাপি লাল রঙে ঝলমল করতে করতে তারা সাইকেল নিয়ে এল এখানে। তাকে দেখে দাঁড়াল। হাসল। একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটা সেই মেয়েটা?

অন্যজন মানে সে প্রবুদ্ধ, বলল, হতে পারে, না হতেও পারে।

সুবুদ্ধ বলল, এইরকম চুল, এইরকম মুখ, এইরকম হাসি।

প্রবুদ্ধ বলল, এই হাসি সেই হাসি না, সুবুদ্ধ বলল, না সেই হাসি তো। একদম না। না। হ্যাঁ...।

প্রেম একদিন এসেছিল নীরবে, আমারও দুয়ারও প্রান্তে..। সুবুদ্ধ যা বলে প্রবুদ্ধ কেটে দেয়। বলতে বলতে ঝুমির চোখে জল। রুমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। অতীন বললেন, কষ্ট পেও না, শোনো এবার অন্য কথা।

॥ আট ॥

এখন অতীনের কাছে বাকিটা শুনে নেওয়া যাক। বাকিটা মানে ১৯৪৫-এ নেত্রকোনা শহরে নাগরার ময়দানে সারা ভারত কৃষক সভার সম্মেলন। মণি সিংয়ের ডাকে হাজং , গারো চাষারা, মুসলমান চাষারা, নমঃশূদ্র চাষারা চলল নেতেরক'না। কিশোরগঞ্জের কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত গান বাঁধল মণি সিংকে নিয়ে,

শুনেন যত দেশবাসী, শুনেন ভাই গরিব চাষি,
শুনেন সর্বজন,
কৃষক দরদি মণি সিংয়ের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দু এক কথা হে করিব বর্ণন।

কী কথা, না রাজবাড়িতে মণি সিং, রাজার ভাগিনেয় দেখে টঙ্ক ধান দিতে এসে হাজং চাষাদিগের কী না হয়রানি। নব্বই তোলায় সের ওজন ধান নিয়ে এসে শোনে রাজার পেয়াদা একশো তোলায় সের চায়। না দেবে তো ধান নেবে না। বসে থাক। রাজা বলেছেন বৈকালে বাহির আঙিনায় আসবেন। তখন বিচার হবে, একশো তোলায় সের নেব না নব্বই তোলায় সের। থেমে থাকা আন্দোলন আবার শুরু হল। রব উঠল,

নব্বই তোলায় সের সের।
কত ঠকাইসো, ঢের ঢের।।
মণি সিং ডাক দিয়েসে।
টঙ্ক দিতা না কহিসে।
টঙ্ক দিবা না, টঙ্ক না।
মিছিল যায় নেতেরক'না।

মিছিল চলল নেত্রকোনা। ময়মনসিংহ তখন বাংলার সবচেয়ে বড় জেলা। সারা ভারত কৃষক সম্মেলন সেখানে। নেত্রকোনায় কত মানুষ এসেছিল? লক্ষাধিক মানুষ। অতীনের দাদা নীতিন তখন বছর বারো। নীতিনের খুব মনে আছে সেই সম্মেলনের কথা। নীতিনের মুখেই শুনেছেন অতীন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনেছেন অতীন পরে তাঁর দাদা নীতিন সরকারের মুখে। নীতিন বলেন, তিনি ছিলেন ভলান্টিয়ার। তিনি তাঁর শিক্ষক ক্ষিতীশবাবুর মুখে শুনলেন, ওই যুবকটির নাম সুভাষ, আর ওই যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সেই প্রথম শোনা। নীতিন বলেন, চশমার ভিতর থেকে অবাক চক্ষু নিয়ে মানুষটি বললেন, গারো পাহাড় দেখতে পাও সুভাষ?

সুভাষ বললেন, দাদা, মেঘের ভিতরে দেখা যায় যেন, আসছে সব গারো পাহাড়ের মানুষ।

মানিক বললেন, এক একটি মানুষ যেন এক একটি পাহাড়।

সুভাষ বললেন, পাহাড় হেঁটে আসছে মাইলের পর মাইল।

পাহাড় পার হয়ে আসছে সিমসাং নদী, কংস নদী, আহা! মানিক অবাক চক্ষু স্থির করলেন মানুষের ঢলে।

সুভাষ বললেন, দাদা, এরা সব জয় করতে এসেছে।

মানিক বললেন, চলো সুভাষ, গারো পাহাড় যাই, টঙ্ক আন্দোলন দেখে আসি, মণি সিং কি নিয়ে যাবে না?

সুভাষ বললেন, মানুষের ভিড়ে মিশে যাব, মানুষের রাস্তাই হবে গারো পাহাড়ের রাস্তা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, পাহাড়ের মতো মানুষের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেঁটে যাব।

সুভাষ বললেন,দাদা, গারো পাহাড়ই আসছে, ওই দেখা যায়, মেঘের ভিতর থেকে পাহাড় নেমে এল।

আহা! কিন্তু এই কথাটা মানিক বলেছিলেন না সুভাষ তা নিয়ে নীতিনের মনে ধন্দ আছে। কখনও মনে হয় মানিক কখনও মনে হয় সুভাষ। তখন বয়স কত কম। কে সুভাষ কে মানিক তা জানেন না। কী তাঁদের পরিচয় তাও জানেন না। একজনের চোখে চশমা। চশমার ভিতরে দীপ্ত চক্ষু মেলে আছেন। অন্যজনের চশমা হয়নি। দৃপ্ত যুবক সুভাষ। কিন্তু কার কথা কার মুখে বসালেন তিনি তা নিয়ে নিজেই নিশ্চিন্ত নন। তাই, কখনও মনে দুজনার কেউ নন, কথাটা বলেছিলেন হাজং নেত্রী কলাবতী। কিংবা তিনিও নন, আর কেউ। যে কেউ। পিঠে বাচ্চা বাঁধা এক হাজং মা কিংবা তির ধনুক নিয়ে আসা এক হাজং পুরুষ। কিন্তু কথাটা কেউ বলেছিল। কথাটা কানে লেগে আছে এই এত বয়সেও। কথাটা শোনার পর সেই কিশোর দেখেছিল গারো পাহাড়। ওই যে মেঘের মতো পাহাড় নেমে আসছে মাটির পৃথিবীতে। কত স্পষ্ট দেখেছিলেন তিনি।

নীতিন এখনও অতীনকে বলেন, আমি কি ভুল দেখেছিলাম, গারো পাহাড় দেখিনি সেদিন?

অতীন বলেন, হয়তো দেখেছিলে, হয়তো না, মানুষ দেখেছিলে দাদা।

পাহাড় ভ্রমে মানুষ দেখেছিলাম অতীন?

হতে পারে দাদা হতে পারে। বলে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন অতীন। সদাহাস্য প্রসন্ন মুখ। তুমি আরও অনেকদিন বেঁচে থাকো দাদা।

হাজং কৃষকদের নিয়ে টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনে মণি সিংয়ের সাথী ললিত সরকার, হাজং যুবক সুভাষের বয়সি, মানিকের সামনে এসে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, আমি কোনওদিন লেখক দেখি নাই, আমি পদ্মানদীর মাঝি পড়েছি, কত গল্প পড়েছি আপনার, কমরেড আপনি কেমন করে লিখেন?

মানিক বললেন, লেখক রক্ত-মাংসের মানুষ, দেখার কিছু নেই কমরেড।

ললিত বললেন, আপনি গারো পাহাড়ের কথা লিখুন।

মানিক তার বিস্ময়ে ভরা চোখ নিয়ে জনসমুদ্র দেখছিলেন। হাসলেন মৃদু, তারপর বললেন, প্রকৃত যুদ্ধ মানুষে করে, আমি সেই সেনানীদের দেখতে এলাম।

ললিত হাজং বললেন, আপনারে ছুঁই একবার মানিকবাবু, বল পাব মনে, আপনি চাষিদিগের এই যুদ্ধের কথা লিখবেন নিশ্চয়।

হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী লেখা হয়েছিল তো। কিন্তু ক'বছর বাদে। তখন দেশ আলাদা হয়ে গেছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে।

নীতিন পরে শুনেছেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধ পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখেছিলেন। নীতিন জানেন দেশ ভাগ হয়ে গেলেও সুভাষ ভোলেননি ললিতকে। তাঁর শেষ সময়ে সুভাষ দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পাশে। নীতিন দেখেছিলেন কিংবা শুনেছিলেন, গারো পাহাড় থেকে হস্তীযূথ এগিয়ে এসেছিল। তারা নাকি সব পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল যাতে পুলিস, মিলিটারি, জমিদারের লেঠেল নেত্রকোনায় প্রবেশ না করতে পারে। এসব শোনা কথা। মিছিল পার করে হাতিরা দাঁড়িয়েছিল কংস নদীর পাড়ে। নদী ঘাটে। আবার হাতিরা এসে দাঁড়িয়েছিল নেত্রকোনা ময়মনসিংহ রাস্তার উপর। যাতে মিলিটারি পুলিস না ঢুকতে পারে শহরে। সব শোনা কথা। কার কাছে শোনা, কে বলেছিল কেউ বলতে পারবে না। অতীন বলছেন, গারো রাজার কাছে শোনা হয়তো। গারো রাজা সেই কুয়াশাঘেরা প্রাসাদে বসে কত কথা শুনিয়েছিলেন তাঁকে।

বিপুল জিজ্ঞেস করে, নেত্রকোনার কৃষক সম্মেলনের কথা শুনেছিলেন গারো রাজার কাছে?

মনে হয়, হস্তীসেনা পাঠিয়েছিলেন গারো রাজা।

আপনি কল্পনা করেছেন? বিপুল জিজ্ঞেস করল।

জানি না কল্পনা না বাস্তব। অস্ফুট গলায় বললেন অতীন, কিন্তু গারো রাজা যে রক্ষা করেন তাঁর প্রজাদের তা বিশ্বাস করে গারো সম্প্রদায়। বিশ্বাস করে, গারো রাজা আছেন। গহিন অরণ্য পাহাড়ে আছেন তিনি। শুনুন আমি শুনেছি না দেখেছি তা বলতে পারব না, কিন্তু গারো রাজা বিলীন হয়ে গেছেন যে অরণ্য পাহাড়ে, তাও সত্য। আসলে আমি কী লিখব আর লিখব না, তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়েছি। আমার সেই কাহিনী এই কাহিনীতে জুড়তে পারে কি না, তাও বলা সম্ভব নয়, আমি শুধু বলি কী দেখেছিলাম, কী না দেখেও ভেবেছিলাম দেখেছি তা এই পাণ্ডুলিপির ভিতরে রেখেছি নিজের মতো করে।

কী হয়েছিল শেষ অবধি? বিপুল জিজ্ঞেস করে।

বলছি। গারো রাজা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। গারো রাজা এক সময় বললেন, সোমেশ্বর পাঠক আসছে, তুমি কি তাকে পথে দেখনি?

তিনি আকাশের তারা হয়ে গেছেন। অতীন বলেছিলেন।

তবে কি আসমানের তারা নেমে আসছে, হলুদ পঙ্খি কি জানে না? বিড়বিড় করতে লাগলেন গারো রাজা।

পাখি উড়তে উড়তে এল রাজার বাড়ি। হলুদ রঙের লেজ, হলুদ রঙের পিঠ, আবছা লাল রঙের পেট আর মাথাটি হলুদ পালকে ভর্তি। সেই পাখি আসলে হলদে পাখি। হলুদ পঙ্খি। নামটি খবরিয়া বাণেশ্বর দিয়েছিল তার বিবিকে। খবরিয়া হল সে, যে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর বলে বেড়ায়। খবরিয়া বাণেশ্বর নিখোঁজ হয়েছিল। রাজার বাড়ি তাকে নিখোঁজ করে দিয়েছিল, খবরিয়া রাজার বাড়ির কথামতো খবর নিয়ে ঘুরত না। তাদের কথামতো খবর করত না। খবরিয়ার কাজ তো রাজার গুণগান করা। কিন্তু তা সে শুনবে কেন? সে কিনা টঙ্ক বিদ্রোহের খবর নিয়ে ঘুরত। খবরিয়া নিখোঁজ হলে গারো রাজা হলুদ পঙ্খিরে ডাক দিলেন। আয় মা, কংস নদীর মা, খবর নিয়ে আয়। খবরিয়ার কাজটি তুই কর। তখন থেকে এই হলুদ পঙ্খি গারো রাজার খবরিয়া। রাজা তারে ডাকে হলুদ পঙ্খি নামে। শুনুন সে হল খবরিয়া পঙ্খি। একজন্মে মানুষ ছিল, টঙ্ক আন্দোলনের সময় খবরিয়া বাণেশ্বরের বিবি ছিল। সে-ও খবর দিয়ে বেড়াত। গাঁয়ের ঘরে ঘরে খবর দিয়ে আসত, কী হয়েছে সুসঙ্গ দুর্গাপুরে। হাতির পায়ে থেতলে মরল কে? টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছে কোন কোন গাঁ। ধান দেওয়া বন্ধ করেছে কারা। চাষারা কেমন লড়াই করছে রাজা আর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। এই সুকৃতির জন্য সে পরজন্মে পাখি হয়েছে। আর আগের জন্মের নাম নিয়েই তা হয়েছে। সেই হলুদ পঙ্খি খবর নিয়ে আসে গারো রাজার বাড়ি। সে খবর নিয়ে আসে রাজার দেশ থেকে। সে উড়তে পারে অনেক উঁচু দিয়ে। ফলে পাহাড়তলির মানুষ তাকে তির দিয়ে ভেদ করতে পারে না। বন্দুকের গুলি তাকে বিদ্ধ করতে পারে না। তার চোখের খুব জোর। কত উঁচু থেকে সে সব দেখতে পায়। কী দেখতে পায়, না গারো রাজার দেশে হচ্ছে কী। অত্যাচারী সেনাবাহিনী আসছে কি আসছে না, খারাপ মানুষ ভালো মানুষের উপর অত্যাচার করছে কি করছে না, সিমসাং নদীতে বান এল কি এল না, নদীর ভিতরে নৌকোডুবি হল কি হল না, এই সব খবর নিয়ে খবরিয়া হলুদ পঙ্খি উড়ে আসে পাহাড়ে। এই সিমসাং নদীর রাজার রাজধানীতে, রাজার কুয়াশা ঘেরা কুয়াশায় গড়া বাড়িতে। রাজায় রাজায় যে যুদ্ধ হবে তা রাজার বাড়ির কেউ জানত না। রাজা না, সেনাপতি না। যুদ্ধ হয়নি কোনও কালেই। কে আসবে যুদ্ধ করতে? যুদ্ধ মানে হিংসা। হিংসা মানে রক্তপাত, মৃত্যু। তার বিরোধী ছিলেন গারো রাজা। যুদ্ধে খুব বিতৃষ্ণা ছিল গারো রাজার, তাই যুদ্ধ হয়নি। কী হয়েছিল সেই সময়? সিমসাং নদীর দেশের রাজা বলেন, কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি, সোমেশ্বর পাঠক আসতেই পারেনি রাজার বাড়ি দখল করতে। এলে ভয়ানক কিছু হতো। রাজার বাড়িতে আগুন লাগত। রক্তপাত হতো। তখনও হলুদ পঙ্খি এসে খবর দিয়েছিল। খবরিয়া পাখি খবর দিয়েছিল। আসছে। রাজামশায় তারা আসছে দামামা বাজিয়ে। যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ! ১৮ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকা সেনাপতি পালিয়ে বনে চলে গেল। মন্ত্রী আর দেওয়ান মনে মনে ভেবে নিল ভিনদেশিরা এলেই তাদের দলে চলে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না। রাজা এসে দাঁড়ালেন বনের ধারে খোলা আকাশের নীচে। যুদ্ধের ভেরি বাজাতে বাজাতে আসছে ভিনদেশিরা। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন আয়। এল। কে এল? যোদ্ধারা না হস্তীসেনা? হস্তীসেনা দিয়ে প্রতিরোধ করলে ভিনদেশিরা মরত সব। কিন্তু হস্তীসেনা প্রস্তুত নেই বলেছিল সেনাপতি। বলে বনপথ দিয়ে সোমেশ্বর পাঠকের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। রাজা কিছুই না করে কুয়াশা ডাকলেন। কুয়াশা নেমে এল আচমকা। আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল যেন। কুয়াশায় ছেয়ে গেল বন-পাহাড়। কুয়াশার দেওয়াল উঠে গেল রাজবাড়ির সব দিকে। সোমেশ্বর পাঠকের সৈন্য আর ভেরিবাদকরা কুয়াশায় পথ হারিয়ে সাতদিন ঘুরেছিল পাহাড়ে আর বনে। তারপর নামতে পেরেছিল নীচে।

হলুদ পঙ্খি হলুদ পঙ্খি, কী খবর? গারো রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

হলুদ পঙ্খি খবর দেয়, পাহাড়তলির রাজ্যে মিলিটারি আসছে ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক নিয়ে, খান সেনা।

পাহাড়তলির রাজা সোমেশ্বর পাঠকের কোনও রাজ্য নেই, আমার রাজ্য সে নিয়েছে, আমি দিয়েছি তাই নিয়েছে, প্রজারা সব আমার। সিমসাং নদীর রাজা বলল।

কেউ বাঁচবে না কামানের হাত থেকে, পাকিস্তানি সেনা নেমেছে যুদ্ধ করতে, যুদ্ধে কোনও বিপক্ষ নেই, আছে প্রজারা, তাদের কোনও বন্দুক নেই, তারা চাষবাস করে খায়। হলুদ পঙ্খি বলল।

যা বলেছিল খবরিয়া পাখি সব সত্যি। সেই যে অনেক বছর আগে সে দেশে মুক্তিযুদ্ধ লাগে। পাকিস্তানি মিলিটারির কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে দা কুড়ুল নিয়ে যুদ্ধে নামে সে দেশের মানুষ। সেই তখনকার কথা হচ্ছিল রাজা আর খবরিয়ার। রাজা বলল, আমার প্রজা, রক্ষা করব আমি।

পাহাড়তলিতে পাকিস্তানি সেনা আসতে না আসতে কুয়াশা নামল দশদিক জুড়ে। আর সেই কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল হাতির পাল। পাকিস্তানিরা পালিয়েছিল। পালাতে গিয়ে নদীর জলে ডুবে মরেছিল। হাতির পায়ের তলায় পিষে মরেছিল।

এ কাহিনী তো জানা। কিন্তু সত্য কি? বিপুল বলল।

ভিতরটা সত্য, খান সেনা পরাস্ত না হলে বাংলাদেশ জন্মাল কেমন করে? বললেন অতীন।

॥ নয় ॥

হ্যাঁ, আগেই শোনা, আগেই বলা, আগেই লেখা কাহিনী। মানুষ কত না কল্পনা করতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা যে হলুদ পঙ্খির খবর শুনে খান সেনাদের প্রতিরোধ করেন, তা যে সদ্য জানা হল। ধরা যায় তা এক রূপকথা। ময়মনসিংহের নতুন গীতিকা।

এসব কথা রাজার মুখের কথা। সাতশো বছর ধরে কত খবরিয়া কত হলুদ পঙ্খি কত খবর নিয়ে উড়ে এসেছে। রাজা শুনেছে আর চুপ করে থেকেছে। বন্যায় ফসল নষ্ট, চাষিদের খুব কষ্ট। রাজা বললেন, পরের সনে বানা হবে না, চাষ হবে ভালো, আমার প্রজাদের কষ্ট হবে না।

কত খবর আসে। একটা শয়তান লোক দলবল নিয়ে খুব ঝামেলা করছে। চাষিদের ঘরে আগুন দিচ্ছে, চাষিদের ফসল লুট করছে। রাজা হাতি পাঠালেন। অন্ধকার রাতে হাতি নেমে গিয়ে লোকটাকে শুঁড়ে করে তুলে এনে বনের ভিতরে ছেড়ে দিল, কুয়াশায় ঘিরে দিল তার চারদিক। সেই কুয়াশা থেকে লোকটা বেরতে পারেনি। খারাপ লোককে কুয়াশার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে শাস্তি। রাজার বাড়ি অভিযান করতে এসে ফিরে গেছে ব্রহ্মদেশের রাজা। কুয়াশায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছিল তারা। তো আমার সমুখে সেই খবরিয়া এক হলুদ পঙ্খি বসল রাজার সমুখে। খবরিয়া খবর আনল একটা লোক আসছে। সে দেখেছে একটা লোক আসছে। রাজার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে একটা লোক আসছে। কেমন মানুষ সে?

খবরিয়া হলুদ পঙ্খি বলল, এমনি মানুষ।

এমনি মানুষ! রাজার বাড়ি আসছে কেন?

হলুদ পঙ্খি খবরিয়া বলল, এমনি আসছে।

এমনি মানে কী? সিমসাং নদীর বুড়ো রাজা জিজ্ঞেস করল।

এমনি মানে এমনি, লোকটা আসছে রাজার বাড়ি দেখতে।

রাজা বললেন, গারো পাহাড়ে রাজার বাড়ি আছে তা কে বলল?

শুনেছে সে। পঙ্খি বলল, সবাই জানে গারো পাহাড়ে গারো রাজার বাড়ি আছে, কিন্তু কেউ খুঁজে পায় না, লোকটা শুনেছে তাই।

কে শুনাল? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ না রাজামশায়, এমনি শুনেছে।

এমনি শুনা যায়? রাজা জিজ্ঞেস করল।

যায় মশায় যায়, বাতাসে রাজার বাড়ির কথা ভেসে বেড়ায়।

তার হাতে অস্ত্র আছে? রাজা জিজ্ঞেস করেন।

না মশায়, সে শান্ত মানুষ। পঙ্খি বলল নম্র স্বরে।

শান্ত মানুষ এতদূর আসে কেন? রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

খবরিয়া পঙ্খি বলল, এমনি আসে মহারাজ, কুয়াশা হয় না যেন মশায়।

মশায় গারো মহারাজ বলল, রাজার বাড়ির পথ কেউ জানবে না, কুয়াশা হবে তবুও সে আসবে এখানে, আসুক সে, কিন্তু এসে করবে কী?

রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। খবরিয়া হলুদ পঙ্খি বলল।

কেন সাক্ষাৎ করবে? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

এমনি মশায়া, এমনি। খবরিয়া পঙ্খি বলল।

এমনি এমনি আর এমনি, এমনির বাইরে হয় না কিছু? রাজা অধৈর্য হয়ে বললেন।

সে জানে মশায়, সে এক ভালোমানুষ। খবরিয়া হলুদ পঙ্খি বলল।

ভালোমানুষ তো আসা কেন? রাজার সন্দেহ যায় না।

পাখি শিস দিয়ে উঠল, পাখি গান গেয়ে উঠল,

সিমসাং নদী, তুমার রাজায় কত না কথা কয়।
সিমসাং নদী আজও দেখি এমনি এমনি বয়।।
এমনি আলো এমনি কুয়া, এমনি মানুষ ভালো।
এমনি জগৎ এমনি পাহাড় এমনি ফুরায় কালো।।

রাজা বললেন, আমার প্রাসাদে ভালোমানুষ আসবে, তাকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করব?

পঙ্খি বলল, খেজুর রস আর পিঠাপুলি, আর হরিণের দুধ।

তারে আমরা কী দেব, কোন মণি রত্ন? রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

হলুদ পঙ্খি বলল, বাঁশের ঝুড়ি আর বেতের ধামাভরা আপেল আর কমলালেবু ,সবুজলেবু, জাম্বুরা দেব।

রাজা তখন বললেন, তাহলে যাও দেখে এসো, কেমনে সে আসে, ঠিক পথে আসে না ভুল পথে যায়?

যাওরে হলুদ পঙ্খি, যাও খবরিয়া,
কে আসে এই পথে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসো তারে নিয়া।
কুয়াশায় কুয়াশা নামে
আন্ধারে আন্ধার
হিমানি নামিয়া আসে,
হিমানির আন্ধার।

সেই যে সেই লোকটা পাহাড়ের পথে কিছুটা চলে আচমকা দেখল কুয়াশা নেমে এল। দুর্ভেদ্য কুয়াশা। এক হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। কিন্তু সে জানত এমনি হবে। কুয়াশার ভিতরেই আত্মরক্ষা করে সিমসাং রাজা। কুয়াশার প্রাচীরের ভিতরই রয়েছে রাজার বাড়ি। গারো পাহাড় আর সিমসাং নদীর রাজার বাড়ি যাচ্ছে সে । সে অন্ধের মতো চলতে লাগল। গারো পাহাড়ে এক রাজার প্রাসাদ আছে, সে তাদের দেখতে এসেছে। দেখে ফিরে যাবে, আর কিছু না। মানুষ এমনি কত কিছু দেখে ফিরে যায়, সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, কত কিছু। এমনিই দেখে ফিরে যায়। সে-ও এমনি দেখে ফিরে যাবে কি যাবে না, তা পরের সিদ্ধান্ত। আর কিছু না। এই যে এত কুয়াশা, এমনি কুয়াশা এল কোথা থেকে, সে শুনেছিল, কুয়াশা পেরিয়ে যেতে হবে রাজার বাড়ি। কত পথ যেতে হবে, কত দূর তা জানে না লোকটি। সে নিজের মতোই চলছিল। ভুল না ঠিক পথ জানে না। কিন্তু যেতে যেতে তার মনে হল কুয়াশার ভিতরে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে। সে ডাক দিল, কেউ আছ, আমি রাজার বাড়ি যাব, কোন পথে যাব?

হলুদ পাখি খবরিয়া ছিল এক শালগাছের ডালে, বলল, যে পথে যাও, রাজার বাড়ি পৌঁছবে।

কোন পথে তাড়াতাড়ি পৌঁছব?

খবরিয়া পাখি বলল, যে পথে যাও, একই দূর।

রাজার বাড়ি উত্তরে না দক্ষিণে, পুবে না পশ্চিমে?

উত্তর দিক দিয়ে যাওয়া যায়, পুব দিক দিয়েও যেতে পার, পশ্চিমে রাজার বাড়ি আবার দক্ষিণেও সেই একই বাড়ি, গারো পাহাড় আর সিমসাং নদীর রাজা তোমার জন্য বসে আছে ধামা ভরা ফল-পাকুড় আর গজা, কদমা নিয়ে। হলুদ পঙ্খি বলল।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়। এমনিই শুনেছিল বটে। সে জিজ্ঞেস করল, আর কত সময় লাগবে?

হলুদ পঙ্খি বলল, সময় কী তা তো জানি না, তুমি ঠিক পৌঁছে যাবে।

লোকটি অনেক লম্বা, স্বাস্থ্যবান,গৌরবর্ণ, সে চলল কুয়াশার ভিতরে। চলতে চলতে চলতে, আচমকা দেখল কুয়াশা নেই। বিকেলের আলো যেন মুছে যেতে যেতেও রয়ে গেছে। রোদ নেই। আলোর ভিতরে সূর্যাস্তের লালচে ভাব।

তখন গারো রাজার সমুখে বসে অতীনের মনে হচ্ছিল রাজার বাড়ি নয়, এক বিভ্রমবাড়ি এসে পড়েছেন তিনি। তিনি স্পষ্ট দেখলেন, কুয়াশার প্রাচীর ভেদ করে এক রাজপুরুষ প্রবেশ করল রাজার বাড়ি। এঁকে তিনি বনের ভিতরে দেখেছিলেন। তাঁর সমুখে অনেক দূরে হেঁটে চলেছিলেন তিনি। তিনিই রাজা সোমেশ্বর পাঠক। আকাশের এক তারা।

কুয়াশার দরজা ভেদ করে লোকটা পৌঁছে গেল। রাজার সমুখে অতিথির জন্য একটি আসন। আসনের সামনে পানীয় জল, মিষ্টান্ন। রাজা তাকিয়ে আছেন অতিথির মুখের দিকে। অতিথিও রাজার দিকে চেয়ে আছেন।

রাজা বিস্মিত গলায় বললেন, তুমি?

হ্যাঁ আমি। লোকটি বলল।

তুমি কি এই প্রাসাদ অধিকার করবে? গারো রাজা অকম্পিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটা মাথা নিচু করল, বলল, আমি সব ফেরত দিতে এসেছি রাজা।

তুমি সোমেশ্বর পাঠক !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ মশায়, রাজা সোমেশ্বর পাঠক।

গারো রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী ফেরত দেবে?

যে রাজ্য জয় করেছিলাম, সেই রাজ্য। বলে দীর্ঘদেহী সেই রাজপুরুষ দুহাত বাড়িয়ে দিলেন।

গারো রাজা বললেন, আমাকে কোন রাজ্য ফেরত দেবে, রাজ্য তো আমার আছে।

আছে! বিস্মিত হলেন রাজা সোমেশ্বর পাঠক।

আছে, আমার রাজ্য তো আমারই আছে, কিছুই তুমি নিতে পারনি।

সোমেশ্বর সিংহর চোখে জল এসে গেল, বললেন, তাই বলছ রাজা?

হ্যাঁ, আমার কিছুই যায়নি রাজা, তুমি কী দেবে?

সোমেশ্বর পাঠক উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন গারো রাজার দিকে। গারো রাজা, সিমসাং নদীর রাজা উঠে এগিয়ে এলেন। আলিঙ্গন করলেন তাঁরা পরস্পরে। আর তখনই অন্ধকার নেমে এল। সূর্যাস্ত হল। প্রাসাদ আর রাজা সব মুছে গেল জগৎ থেকে। দেখল সব সেই হলুদ পাখি খবরিয়া। সে উড়ে গেল এই কাহিনী নিয়ে। রাজার বাড়ি নেই। দুই রাজা আর নেই। কুয়াশা আর নেই। আমি পাহাড় থেকে ফিরে এলাম। হ্যাঁ, সেই হলুদ পাখি আর আমার সামনেই যেন সব ঘটেছিল। অথবা সমস্তটাই এই পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল। পাণ্ডুলিপি থেকেই তো আমি শোনাচ্ছি এই কাহিনী।

কাহিনী শেষ হলে রুমি বলল, কতবার শুনছি।

ঝুমি হাসে, দিদি, তুই যে কী বলিস, কোথায় শুনলি?

কেন তোর মনে নেই? রুমি জিজ্ঞেস করল।

আমি কিছুই শুনি নাই। বলল ঝুমি।

আমি শুনেছি সব আগে, মার কাছে শুনেছি। বলল রুমি।

মা আমারে বলে নাই। ঝুমি বিড়বিড় করল, মা কি তোরে আলাদা করে বলেছিল।

রুমি বলল, বলেছিল, তুই যদি না শুনে থাকিস, মা আমারে আলাদা করেই বলেছিল বলা যায়।

ঝুমি বলল, মা এত কথা জানল কী করে?

সে মা জানত, হয়তো বাবা বলেছিল, তুই যে বসন্তের কথা বলেছিলি, ওইটা তোর কথা না, মা-র কথা, মা বলেছিল, মায়ের মুখে আমি শুনেছি মনে হয়।

ইস, মা কি এমন প্রেমের কথা বলতে পারে? ঝুমি মাথা নাড়ে।

পারে, মায়ের কি আমাদের বয়স ছিল না? বলল রুমি।

ঝুমি চুপ করে থাকে। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। বিপুল তখন বলল, তোমরা একজন অন্যজনের কথা কেটে দাও শুধু, একসঙ্গে দুই বোন থাকো কী করে?

রুমি বলল, আমাদের ওইরকম, ওইরকম না হলে আমাদের ভালোবাসা হয় না।

ঝুমি বলল, তা বলে দিদি, মা অমন বসন্তের কথা বলল কী করে, এ তো আমার ভালোবাসার কথা রে।

মা বলেছিল, তখন আমার তেরো, তুই বারো, তুই ছোট, আমি বড়, বাবার মন নাই সংসারে, বাবা সেই যে তার শালি, আমাদের চন্দনা মাসির কাছে যেত, গিয়ে আর ফিরত না।

চন্দনা মাসির ছেলের জন্য কবরেজি ওষুধ নিয়ে যেত যে। ঝুমি ম্রিয়মাণ গলায় বলল।

না, চন্দনামাসির রূপে পাগল হয়েছিল বাবা, মা তখন আমাকে সেই বসন্তের কথা বলেছিল, মনে কর আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে, ইন্ডিয়ার গান, মা নেই তবু বসন্ত আসে। বলতে বলতে নীরব হল রুমি।

॥ দশ ॥

কুয়াশা দুপুর পেরিয়ে বেলা পড়ে এলে কাটত, সূর্যের মুখ দেখা যেত একবার, তারপর সন্ধ্যা, অন্ধকার, শীত, কুয়াশা। সন্ধ্যা নামলে কুয়াশা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করত সব দিক। কুয়াশার ভিতরেই কি তারা দু'জন ফিরে যাবে নেত্রকোনা? যা ঘটার ঘটে গেছে। কুয়াশা আর নতুন কী ঘটাতে পারে?

পাণ্ডুলিপি খুলে অতীন বললেন, টঙ্ক আন্দোলনের কথা তো বলতে গেলে আরম্ভই করা হয়নি। দুর্ভিক্ষ গেছে, তখন পাকিস্তান পাকিস্তান রব উঠেছে। রাজার বাড়ি শূন্য হয়ে যাচ্ছে। সুসঙ্গ দুর্গাপুরে রাজার বাড়ি, একটা না, চারটে। চার শরিকে ভাগ হয়ে গিয়েছিল সম্পত্তি অনেক আগেই, রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহর আমল থেকে। বড় বাড়ি, মেজ বাড়ি, আবু বাড়ি বা ছোট বাড়ি এবং দু'আনি বাড়ি। আর যে বাড়িতে রুমি ঝুমি, দুই বোন থাকে তাদের বাবা গোপাল দাসের সঙ্গে, সেটি দু'আনি বাড়ি। আর গ্রাম পরিষদের এই বাংলো বাড়ির পাশে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে ছোট রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। বড় বাড়িতে ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখন কলেজ সরে গেছে। বড় বাড়িতে এখন পাবেন একটি মজে যাওয়া মস্ত ইঁদারা ও ভাঙা প্রাচীর। কিস্যু নেই, কিস্যু নেই। সেই যে সোমেশ্বর সিংহ আর গারো রাজা মিললেন, সেই যে কুয়াশার ভিতরে তাঁরা নিঃশেষ হলেন, তারপর থেকে রাজার চিহ্ন বিলুপ্ত হতে আরম্ভ করল এপারে। পাকিস্তান জন্ম নিচ্ছে। হিন্দু রাজা, জমিদার, তালুকদাররা দেখছে সত্যিই পাকিস্তান প্রস্তাব মানে কি না ব্রিটিশ বাহাদুর। নাকি অবিভক্ত বাংলা জন্ম দেয় হিন্দু মুসলমান এক হয়ে। কিন্তু তাতে রাজি ছিলেন না রাজা, জমিদার বাহাদুররা। মুসলমান চাষারাও খেপেছে হাজং পাহাড়িয়াদের সঙ্গে। তারাও চাইছে জমিদারি উঠে যাক, চাষার খামারে ধান যাক। এই সময় সুসঙ্গ দুর্গাপুরের ইস্কুল মাঠে সভা ডাকলেন মণি সিং, ললিত হাজং। টঙ্কর দের কথা কেউ ভোলেনি।

টঙ্কের কথা কেউ ভুলেনি।
টঙ্ক আর দিয়া হবেনি।
মণি সিং ডাক দিয়েছে।
ললিত হাজং সঙ্গে আছে।

রাজা জমিদার তালুকদাররা ভয় পেল। এখনই কেউ দেয়, কেউ দেয় না, ধানের ভাগ ঘরে আসে না। রাজার গোমস্তা নায়েব প্রস্তাব দিয়েছে, ফসলের ভাগ কিছু কিছু দাও। কিন্তু সকলে তা মানে না। কিছু দিন চুপ থেকে আবার মণি সিং মাঠে নেমেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে রব উঠেছে সুসঙ্গ দুর্গাপুর চলো। তখন থানা পুলিস করল জমিদারে। মিটিং বন্ধ করতে হবে। মণি সিং চাষা খেপাতে মাঠে নেমেছে। মণি সিং বিপ্লব করতে চায়। রুশ দেশে কমিউনিস্ট শাসন, মণি সিং রুশ দেশের কমরেড লেনিন হতে চায়। এদেশে কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখছে। তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। সভা ভাঙতে রাস্তায় কাঁটাতার লাগল। সভা ভাঙতে পুলিস নামল সভাস্থলে। কিন্তু মণি সিং আর ললিত সরকার হাজংয়ের ডাক, সব ভয় উড়িয়ে দিল। তির, ধনুক, দা, কুড়ুল, কাস্তে হাতে হাজং চাষিদের মিছিল আসতে লাগল। সেই মিছিল ভেঙে দিল কাঁটাতার। বিদ্রোহ শুরু হল। ক্ষুব্ধ চাষিরা টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ল, রাজবাড়ির বজরা ডুবাল, গারো পাহাড় যেন সচল হল। চাষিরা রব তুলল,

আসে আসে, গারো পাহাড় ওই আগুয়ে আসে।
টঙ্ক দিব না, টঙ্ক না, কাত্তিক, আঘুন মাসে।।

ললিত সরকার, বিপিন গুণ, মঙ্গলচাঁদ সরকার, কাঙাল দাস, এনারা সব হাজং নেতা কর্মী। আর ছিল রাশিমণি, ভদ্রমণি, কলাবতী, স্বরূপা, অশ্বমণি নেত্রীরা। দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জমির চাষা জমিতে থাকছে। জমিদার ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার গোমস্তা, নায়েব রয়ে যাচ্ছে। টঙ্ক দিতেই হবে। টঙ্কের ভাগ কালেক্টর পায়। কালেক্টর মানে ব্রিটিশ সরকার পায়। তা ছাড়বে কেন? শেষ মুহূর্তে যা আদায় হয়, তা হয় নিয়ে যাবে ইংল্যান্ডে, না হয় রাজকোষে জমা করে রেখে যাবে কলহে মত্ত দুই ধর্মের মানুষের দুই দেশের শাসকদের জন্য। তারা এদেশ দিয়ে যাবে জমিদার, রাজা-সামন্ত প্রভুদের হাতে। তার আগে চাষাদের দমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে। তারা নীল বিদ্রোহ দমন করেছিল। এদিকে কত নীলকুঠি পড়ে আছে এখনও। জার্মানিতে নীল তৈরি না হলে এই চাষাদের নীল চাষই করতে হতো। শ্বেতাঙ্গ প্রভু যা বলবে কালা আদমি, জমিদার আর রাজাকে তাই করতে হবে। আর রাজা জমিদার যা বলবে চাষাদের তাই করতে হবে। শাসনের নিয়ম এমন। সেই গরিব চাষা, খেতমজুর যদি গলা তুলে কথা বলে, রাজা, জমিদারের মান থাকে না, ইংল্যান্ডের রানির মানও থাকে না। ১৯৪৬-এর নভেম্বরে জন ব্যাস্টিন ময়মনসিঙের জেলাশাসক কাম রেভিনিউ কালেক্টরের দায়িত্ব নিলেন। দায়িত্ব নিয়েই কালেক্টর সায়েব হুকুম জারি করলেন, টঙ্ক রদ হবে না, দিতেই হবে, হাল, সাবেক যা পড়ে আছে আদায় করো। আগে টঙ্ক মিটাও, পরে কথা। না মিটালে সশস্ত্র পুলিস, মিলিটারি যাবে। মিলিটারিও গেল। হায় হায় হায়,

আগে যদি ব্যাস্টিন আইত।
টঙ্কের ধান জমিদারে লইত।।
ব্যাস্টিন তুমু রাজার রাজা
সা'জন্মের পভু
জমিদারে টঙ্ক মাগে
চাষায় দেয় না তবু।

কালেক্টর হুজুর ব্যাস্টিন, আপনি আমাদের রক্ষা করেন। গোমস্তা নিয়ে জমিদার, ভূম্যধিকারীরা প্রণত হলেন ব্যাস্টিন সায়েবের পায়েই বলা যায়।

কালেক্টর ব্যাস্টিনের এক কেরানি ছিল, বড়বাবু, তাঁর নাম গুরুপদ চন্দ্র। বাড়ি তার গারো পাহাড়ের দেশে, বিরিসিরি গ্রাম। তার নিজের জমিও টঙ্কে দেয়া ছিল। আসলে রাজার জমি। সে রায়ত। রায়তও টঙ্ক থোকে দেয় রাজার কাছারিতে একবার, চৈত্র শেষে। কিন্তু নির্ধারিত সেই থোক টঙ্ক ডবল পাওয়ার কথা চাষাদের কাছ থেকে। ক'বছর পাচ্ছে না। তার ফলে রাজার কাছারিতে দেয় টঙ্কের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সাবেক হাল মিলে কম নয়। কিছু করে দিতে হচ্ছে তার বেতন আর উপরি আয় থেকে। উপরি না থাকলে গুরুপদকে খুব অভাবে থাকতে হতো। বউয়ের জন্য তিন মাস অন্তর গয়না গড়াতে হতো না। এখন ব্যাস্টিন কী করেন, পাকিস্তান হচ্ছে, গুরুপদ অপেক্ষা করছে গারো পাহাড়ের দেশ ইন্ডিয়ায় থাকে না পাকিস্তানে যায়। ইন্ডিয়ায় থাকলে সায়েবের পা ধরে আগেই সে নেত্রকোনা মহকুমা অফিসে বদলি নিয়ে নেবে। গুরুপদ চন্দ্রর ভালো এক গুণ আছে। ব্যাস্টিন সায়েবের তা খুব পছন্দের। সে নিজে কামরূপ-কামাখ্যা থেকে তন্ত্র-মন্ত্র শিখে আসা মানুষ। কামরূপ গিয়ে সে নাকি ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র সব শিখে এসেছিল। বড়বাবু গুরুপদ সায়েবের ডান হাত, বাম হাত। ডান চক্ষু, বাম চক্ষু। গুরুপদ বলত সে সব দেখতে পায়। কী দেখতে পায়, না অনেকদূর দেখতে পায়। কিন্তু সবার চেয়ে বেশি দেখতে পায় কিসে ভবিষ্যৎ ভালো হবে। কিন্তু এও জানে তার চেয়ে বেশি দেখতে পায় সায়েব, ময়মনসিঙের জেলাশাসক, খাজনা আদায়কারী কালেক্টর জন ব্যাস্টিন।

ব্যাস্টিন জিজ্ঞেস করে, ইয়েস গুরুপডা, টমার নেটিভ ভিলেজ তমি ডেকিতে পাও মন্ত্র ডিয়া?

হুজুর গারো পাহাড়ের কোলে, মিটিং চলছে, আমি দেখতে পাই। গুরুপদ তার কামরূপি বিদ্যা প্রয়োগ করল। এই বিদ্যা দিয়ে আগের গোরা সায়েব কালেক্টরকে সে মুগ্ধ করেছিল। সে বলত, ইন্ডিয়ায় কী সব রহিয়াছে, পিপল বলিয়া থাকে এক এক ইস্তানে ২০০-৩০০ বছরের মানুষ গুরিয়া বেড়ায়।

গুরুপদ বলত, ঘুরিয়া বেড়ায় স্যার, গারো পাহাড়ের দেশে এমন বেড়ায়, বুঝা যাবে না কার কত বয়েস, একশো দুশো তো আছেই।

বলিয়া থাকে মানুষকে মন্ত্র দিইয়া গোরু ছাগল করিয়া দেয়। কালেক্টরের বচন।

গুরুপদ বলেছিল, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার আমি পারি, আই ক্যান, মানুষকে ভেড়া করে দিতে পারি স্যার, ল্যাম্ব।

স্টপ গুরুপডা, স্টপ, আই ডোন'ট লাইক আ লায়ার।

গুরুপদ আর সেই সায়েবের সামনে মুখ খোলেনি। ভয় করত। সায়েব কেমন বুঝতে পারত না। ভালো না মন্দ! শ্বেতাঙ্গ জাতিকে সে খুব ভয় করে। সায়েব বলেছিল, কনভারট ইওর ওয়াইফ ইনটু আ কাও, ডোন্ট টেল আ লাই, গুরুপডা।

সেই সায়েব নাইজেল স্মিথ চলে যেতে গুরুপদ বেঁচেছে। লোকটা তার উপরিও বন্ধ করে দিয়েছিল। আর এই কালেক্টর ব্যাস্টিন সায়েব বলে, শুনো গুরুপডা, আই বিলিভ তন্ত্র-মন্ত্রা, ব্ল্যাক ম্যাজিক, এই সব পিজ্যান্ট রিভোলিউশন আমার কাউন্টিতে হলে, সব বাস্টারড মরে থাকত নিজের কোঠির সামনে, মন্ত্র দিয়াই মেরে ফেলা যায়, মায় গ্র্যান্ড পা ক্যান ডু দিজ, গুরুপডা আমি সব গুলি করে মেরে দিব, স্লেভ স্লেভের মতো থাকব।

গুরুপদ বলে, হুজুর মা বাপ, আমিও স্লেভ, আই অ্যাম এ গরমেন্ট সারভেন্ট, তার মানে কালেক্টর'স সারভেন্ট স্যার, কালেক্টরের স্লেভ।

ব্যাস্টিন বলে, গুড, পুওর পিজান্ট্রিকে আমি পিপীলিকার মতো টিপা টিপা মারব।

গুরুপদ বলে, তাইই হবে, ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি, সব মরে পড়ে আছে স্যার।

শুনো গুরুপদ, মায় গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদার ইজ আ ডেমন।

হুজুর তার মানে? গুরুপদ চন্দ্র অবাক হয়, ভয়ও পায় সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে।

মনস্টার, ডেমন। সায়েবের গলা গমগম করে উঠল।

গুরুপদ চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে না। মনস্টার কী, ডেমনই বা কী, তারা কি জমিদার, রাজার চেয়ে বেশি মৌজার জমি ভোগ করে। তার জমিতে চাষারা বেগার দিয়েই যায়। টঙ্ক আদায় করে চোখ রাঙিয়ে। অন্যথা হলেই চাবুক। কিংবা হাতির পায়ের তলায় চাষাকে পিষে মারে? চাবুক দিয়ে দু-চারটে মানুষ মেরে ফেলতে পারলেই সব ঠান্ডা হয়ে যায়।

ইউ, ইডিয়ট, মনস্টার, আই মিন রাক্সোস, ডু ইউ নো রাক্সোস, ইভিল স্পিরিট?

আজ্ঞে স্যার। গুরুপদর ভয় করে। ইয়েস স্যার। বুঝতে পারে ডেমন অতি ভয়ানক।

তারপর ব্যাস্টিন সায়েব যা বলেছিল, তা আরও ভয়ানক। ইংল্যান্ডের গ্রাহাম ভিল কাউন্টির মালিক, জমিদার বংশের ছেলে ব্যাস্টিন তার প্রপিতামহর বিদ্যা অল্প-স্বল্প জানে। কিন্তু তা যতটা জানে, তা দিয়ে এই দেশে এসে বাঁচতে পারত না। ডেমন গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদার, সিনিয়র ব্যাস্টিন তার সহায় না থাকলে এই ভূত-প্রেতের দেশে তার টিকে থাকাই কঠিন হয়ে যেত। ম্যালেরিয়া হয়ে মরে যেত। বিছানায় শুয়ে ভুগে ভুগে মরে যেত। ফ্রিডম ফাইটার সন্ত্রাসবাদীদের বোমায় মরে যেত। পেটের রোগে মরে যেত। গ্রেট-গ্র্যান্ড পা তার সঙ্গে আছে। ডেমন প্রপিতামহ। নটরিয়াস সিনিয়র ব্যাস্টিন।

ঠাকুরদার বাবা একটা দুর্গে একা থাকত। বছরে একবার বাইরে আসত। শোনা যায়, ঠাকুরদার বাবা, সিনিয়র ব্যাস্টিনের দুর্গে একটা কাফ্রি দাস ছিল। লোকটা সাতফুট লম্বা। ভয়ানক কালো। চোখ দুটি লাল আগুনের গোলা যেন। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করলে গা হিম হয়ে যেত। সে নাকি জীবন্ত প্রাণীর রক্ত, মাংস খেত। বড়-ঠাকুরদাও তাই। সেই কাফ্রি দাসকে তন্ত্র-মন্ত্রের সাথী করেছিল বড়-ঠাকুরদা। কাফ্রি দাস তাঁর কাছ থেকেই রাক্ষস বিদ্যা শিখেছিল। শিখিয়েছিল সিনিয়র ব্যাস্টিন। গ্রাহাম ব্যাস্টিন। তাদের জমিদারির চাষিরা, গ্রাহাম ভিলের চাষিরা রেভিনিউ দেবে না বলেছিল, তার আগে বৃষ্টি বাদলে ফসল নষ্ট হয়েছে। এক রাত্রে তেরোজন মরে পড়েছিল রাস্তায়, বনের ধারে আর খেতের ধারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড্রাই হয়ে গিয়েছিল সান্টা লুসিয়া লেক। ওই লেকের জল খেত চাষারা। দেখা গিয়েছিল সকল মরা মানুষের চোখ খুবলে নিয়েছে কোনও প্রাণী। পেটের কাছ থেকে মাংস খেয়ে গেছে। তারপর থেকে রেভিনিউ দেওয়া আরম্ভ হল। সিনিয়র ব্যাস্টিন সেই গ্রামে সন্ধ্যায় তাঁর কাফ্রি দাসকে নিয়ে নেমে এসেছিলেন পাহাড়ের উপরের দুর্গ থেকে। ব্ল্যাক ফোর্ট, কালো দুর্গ, ফোর্ট অফ দ্য ডেমন, দানবের দুর্গ নাম হয়ে গেল সেই দুর্গের। রেভিনিউ দেওয়া আরম্ভ হলে লেকের জল ফিরে এসেছিল, কিন্তু এখনও সেই লেকের নাম, ড্রাই লেক। তার ওপারের ভিলেজের নাম ড্রাই লেক ভিলেজ। আর রাস্তার নাম ড্রাই লেক রোড। ড্রাই লেকের আর এক নাম ব্যাস্টিন লেক। নাম শুনলেই চাষারা ভয়ে ঈশ্বরের নাম নেয়। প্রভু রক্ষা করো। সূর্যাস্তের সময় ডেমনের ছায়া লেকের উপর পড়ে। সবার আগে সেই লেকে রাত্রি নামে। সবার শেষে সেই লেকে আলো ফোটে। সেই লেকে কত মানুষ আত্মহত্যা করে। সুইসাইড লেকও সেই লেক। তার জল কেউ খায় না। সেই লেকে হাঁস নামত আগে, এখন আর নামে না। ডেমন ব্যাস্টিন আর তার দাস ব্ল্যাকিকে বুনো হাঁসেরাও ভয় করত। পাখিরাই তো আগে সব টের পায়। একবার তেরোটা হাঁস মরতে সেই যে তারা উড়ে গেল...।

হুজুর! গুরুপদর মনে হয় কামরূপ-কামাক্ষ্যার তন্ত্র-মন্ত্র যা সে জানে তার এত ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা শুধু গোরু ছাগল ভেড়া করে দেওয়ার ভয় দেখানোর। কালেক্টর জন ব্যাস্টিন বলে, তার গ্রেট-গ্র্যান্ড পা তার সঙ্গে আছে। বললেই ডেমন তার কাজ আরম্ভ করে দেবে। টঙ্ক দেবে না, খাজনা দেবে না, এই অনাচার সহ্য করা হবে না, নেটিভ ইন্ডিয়ানদের এমন শিক্ষা দিয়ে যাবে তারা যে সাত জন্মেও ভুলবে না স্বাধীন হলেও।

॥ এগারো ॥

কালেক্টর ব্যাস্টিন খুব রাগী। মায়া-মমতা ছিল না সায়েবের। ডেমনের উত্তরাধিকার নিয়ে তার জন্ম তো। বলে, এক রাত্রে গাঁ সাফ করে দিতে পারে তার সঙ্গের দুই ডেমন। দানব। সিনিয়র ব্যাস্টিন আর তার দাস। গুরুপদা বুলাও, মণি সিং কো বুলাও।

মণি সিং মণি সিং, গ্রামে গ্রামে ডাক দিয়েসে।

টঙ্ক দিব না জমি দিব না, মণি সিং এই কয়েসে।

ব্যাস্টিন বলল, মণি সিং কো লে আও, আই হেট পুওর পিজান্ট্রি।

গুরুপদ কেরানি বলে, আই অলসো হেট, হেট স্যার।

ব্যাস্টিন বলল, মিলিটারি পাঠাও, কালেক্টার'স হাউজ ইজ মনস্টার'স হাউজ, কালেক্টর জন ব্যাস্টিন ইজ ক্যারিইং মনস্টার'স ব্লাড।

ইয়েস স্যার, আপনি আগে এলে মণি সিং এত সাহস পেত না। বলে গুরুপদ।

টমি পারব না, হামি পারব, ডেথ ইজ ওয়েটিং ফর মণি সিং।

ইয়েস স্যার ফাঁসি হবে। গুরুপদ বলল।

হি হ্যাজ স্টারটেড ফর আ সানসেট ভ্যালি।

ইয়েস স্যার, হুজুর।

মায় গ্রেট-গ্র্যান্ড ফাদার ইজ ওয়েটিং দেয়ার।

গুরুপদ কিছুই বুঝল না। সূর্যাস্তের পথই বা কী, সূর্যাস্তের উপত্যকার দিকে হাঁটাই বা কী। ব্যাস্টিন সায়েব ভাট বকে। কিন্তু কালেক্টর সায়েব যা বলে তাই অমৃত। তা-ই গুরু-বাণী। সুতরাং বিশ্বাস করতেই হবে। ব্যাস্টিন বলে, কেন স্বাধীনতা দিয়া হইতেছে, কারণ নাই, ইন্ডিয়ানরা শ্লেভের জাত, ফ্রিডম ইজ নট দেয়ার রাইট।

গারো পাহাড়ের দেশে মিলিটারি নামল। মিলিটারির সহায় ডেমন সিনিয়র ব্যাস্টিন আর তার কাফ্রি দাস। আগে বিদ্রোহী চাষাদের ভয়ে পুলিস টঙ্কের ধান কিংবা টাকা আদায় করতে গিয়ে ফিরে আসত চাষাদের তাড়া খেয়ে, এবার মিলিটারি পাঠিয়ে কালেক্টর ব্যাস্টিন বিনা অনুমতিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করল, বহিরাগতদের যাতায়াত বেআইনি ঘোষণা করল। কৃষক নেতা মণি সিং, ললিত হাজং, নিজ নিজ গাঁয়ে থাকবে, অন্য গাঁয়ে যাবে না। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্যাস্টিনের আদেশ ফু হয়ে গেল। নিজদেশে আবার বহিরাগত কী? মণি সিং গোপনে ছোট ছোট মিটিং করতে লাগলেন এ গ্রাম সে গ্রামে। বলতে লাগলেন, জোট বাঁধো তৈরি হও। জমিদারি উচ্ছেদ করতে হবে। দাবির সঙ্গে দাবি জুড়ে যাবে। জমি জমা সব ভূমিহীন চাষিদের ভিতর বিলি করে দিতে হবে। লাঙল যার জমি তার।

কিন্তু প্রশাসন বসে ছিল না। কালেক্টরের কথামতো, বিরিসিরি, রানিখং, হালুয়াঘাটের বিরুই-ডাকিনি, নলিতাবাড়ির বাওইদাবার ক্যাথলিক মিশনগুলি থানায় খবর দিতে লাগল মণি সিং আজ এসেছিল, মণি সিং মিটিং করে চলে গেল, মণি সিং চাষা খেপাচ্ছে। মিশনের ফাদাররা ব্যাস্টিন সায়েবের চরের কাজ করছিল তার হুকুমে। না করলে ফাদাররা কালেক্টরের রোষে পড়বে। মিশন আরও কাজ করছিল। যিশুর নামে খ্রিস্টান চাষাদের বলছিল মণি সিংয়ের সঙ্গে না থাকতে। টঙ্ক দিয়ে চাষ করতে। গডের হুকুম তাই। গড বলেন, প্রভুর অনিষ্ট না করতে। সদা প্রভু বলেন, রাজা-জমিদার গডের প্রতিনিধি। খ্রিস্টান গ্রাম আলাদা হয়ে গেল মিশনারি ফাদারের নির্দেশে। ফাদারের কথা কে অমান্য করবে? ফাদারই বা কালেক্টর ব্যাস্টিনের কথা অমান্য করে কীভাবে? কালেক্টরের কলমের খোঁচায় ফাদারকে বার্মা কিংবা থাই মুলুকে চলে যেতে হতে পারে। মিশনারির ফাদার খবর দিল, মণি সিং শুধু নয়, আরও আছে, তারাও চাষাদের খেপাচ্ছে। টঙ্ক দিব না বলছে।

লিস্ট পাঠাও। কালেক্টর ব্যাস্টিনের পেয়াদা মানে থানার পেয়াদা এসে বলল, তালিকা দাও, সায়েবের কাছে তালিকা যাবে।

তালিকা গেল, তালিকায় গ্রাম ধরে ধরে নাম দেওয়া হল। মহিলা নেত্রীদের নামও গেল। রাশিমণি, ভদ্রমণি, কুমুদিনী, অশ্বমণি, কলাবতী, স্বরূপা। পুরুষদের নাম গেল, লঙ্কেশ্বর, বিপিন, মঙ্গলচাঁদ, কাঙাল, বল্লভী বক্সি— সব হাজং নেত্রী নেতা। পাদরিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগল ব্যাস্টিনের নির্দেশে। বলতে লাগল, কালেক্টর আদেশ দিয়েছে। কালেক্টরের আদেশ সদা প্রভুর আদেশ। টঙ্ক আন্দোলন আর মণি সিঙের সভা মিছিল ত্যাগ করো। ধর্ম পথে এসো। অধর্মের পথ পরিহার করো।

এসো ধর্ম পথে, এসো প্রভুর পথে।
মরণে স্বর্গে যাব সোনার রথে।।

বাইবেল নিয়ে পাদরিরা ঘোরে আর কালেক্টর জন ব্যাস্টিনের মহিমা কীর্তন করে। মণি সিঙের পথ অধর্মের পথ তা ঘোষণা করে বারংবার।

কালেক্টর ব্যাস্টিন, মহামহিম তিনি।
সদাপ্রভু ঈশ্বরের সুসন্তান যিনি।।
ব্যাস্টিন মহাপ্রভু, মুরা তাঁর দাস।
চাষাগণ করহ টঙ্কয় চাষ।।
হুকুম দিইসে সায়েব, টঙ্ক মিটাও।
মণি সিং, ললিতেরে হিয়াসে হুটাও।।

শুনে মঙ্গল হাজং বলে, চাষায় টঙ্ক দিবে আর না খেয়া মরিব?

পাদরি নরটন বললেন, যাচ্ঞা করো, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ করো, পাইবে, দ্বারে আঘাত করো, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে...।

মঙ্গল হাজং বলল, বুঝতে পারলাম না প্রভু।

বুঝতে হবে না, ধর্ম পথে এসো, ঈশ্বর তোমার মাথায় হাত রাখবেন।

মঙ্গল হাজং বলল, সাধু ঠাকুর, ঘরে ছানা-পুনা না খেয়া থাকে যদি, ভগবানের কথা মনে থাকে না।

পাদরি নরটন সায়েব বলে, এই পথে কি অন্ন আসিবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, আসিবে। হাজং চাষা বলে।

পাদরি নরটন সায়েব বলে, গড ব্লেস ইউ মায় চাইল্ড, মণি সিং ইজ আ ডেমন, ইভিল স্পিরিট ইজ লিভিং ইন আ ইভিল সোল, দুষ্টাত্মার ভিতরে দুষ্ট শক্তি বাস করিতেছে, বি কেয়ারফুল, মণি উইল ডেস্ট্রয় ইওর লাইফ।

গির্জার সাধু যা বলবে, যিশুর ধর্মের মানুষকে তা বিশ্বাস করতে হয়ই। কিন্তু পেটের ভাতের কথা তো ভাবতে হয়। টঙ্ক দিতে হলে, সংবৎসরের অন্ন জুটবে না। হায় হায়, মণি সিং তুমু বলো, চাষা করবে কী? খ্রিস্টান গ্রাম সতর্ক হয়ে যাচ্ছে। আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মিশন বলছে, কালেক্টর বলছে হাল বকেয়া টঙ্ক সব মকুব করে দেবে, শুধু মণি সিংয়ের সঙ্গ ছাড়তে হবে। খ্রিস্টান চাষাদের ঢেলে দেবে কালেক্টর হুজুর। হাজং দেশ করে দেবে কালেক্টর হুজুর। এখন মণি সিংকে ছাড়তে হবে।

মণি সিংকে ছাড়তে হবে।/ তাইলে নতুন দেশ পাবে।।
না ছাড়লে বিপদ জেনো।/ কয়েদখানায় ঘানি টেনো।।

ময়মনসিঙে কালেক্টর জুনিয়র ব্যাস্টিন তখন তার কেরানিবাবু গুরুপদকে বলে, মণি সিং কি ইন্ডিয়ান যোগী, মায় গ্রেট- গ্র্যান্ড পা বলছে মিলিটারি দিয়ে পিজান্টদের লাশ ফেলে দিতা, বিটন টু ডেথ, টঙ্ক দিতেই হবে। মিলিটারি গিয়ে লিস্ট মুতাবেক ফিমেল লিডারদের তুলে আনুক, ইন দ্য নেম অফ গড, আওয়ার মিশন ইজ ডুইং ওয়েল। মিলিটারি লাশ ফেলুক, রেপ করুক। ফাক দেয়ার মাদার, বিপ্লব উঠে যাবে।

হুজুর মা বাপ। কেরানি গুরুপদ ভয় পায়।

লিস্টে যেসব ফিমেল লিডারের নাম আছে, সব কো রেপ করনা হোগা।

হুজুর যা বলেন। গুরুপদ জোড়হস্ত। ব্যাস্টিন সায়েব বলেই যায়। কত হিংস্রতার সঙ্গে দমন করা হবে চাষাদের বিদ্রোহ, বলেই যায়। গুরুপদকে শুনতে হয়। শুনবে সে। এর পরে সায়েবকে বলে নেত্রকোনা ফিরে যাবে। মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে ছড়ি ঘোরাবে। খোদ ব্যাস্টিন সায়েবের লোক যে সে। দেশের স্বাধীনতা দরকার নেই। সায়েবের পায়ের নীচে থাকা ভালো। গুরুপদ সায়েবের জুতোর ফিতে বেঁধে দেয়।

রুমি, ঝুমি শুনতে শুনতে সজল চক্ষু, রুমি জিজ্ঞেস করে, স্যার সব সত্যি?

পাণ্ডুলিপিতে আছে। অতীন বললেন।

এই কথা কেউ বলেনি স্যার। রুমি বলে।

ঝুমি বলল, তারা হয়তো জানত।

রুমি জিজ্ঞেস করল, এই সেই তারা কারা রে?

ঝুমি চুপ করে থাকে। জানালার দিকে তার চোখ। পড়ন্ত বেলায় কুয়াশা তরল হয়ে সব কিছু প্রকাশ্য হয়ে যাচ্ছে। গাছ-গাছালি, আকাশ, নদী, পাহাড়। সে গারো পাহাড়ের কথা ভাবছিল। আশুথতলী। বাবা ফেরেনি দুদিন। বাবা তাদের খুঁজেই আনবে। দুই বোন রাঁধা-বাড়া করে খাচ্ছে। আর তারপর চলে আসছে অতীন স্যারের কাছে। কী বলছে অতীন স্যার, জানা দরকার। পাণ্ডুলিপিতে কি সুবুদ্ধ আছে, প্রবুদ্ধ?

মিলিটারি রওনা হল গারো পাহাড়ের দেশে। মিলিটারির সঙ্গে বাতাসে বাতাসে চলে ডেমন ব্যাস্টিন এবং তার কাফ্রি দাস। হেলিকপ্টারের পাখার উপরে বসে থাকে তারা। বয়স হয়েছে ডেমনের। ভাসতে ভাসতে ক্লান্তি আসে এখন। ডেমন বলে কি প্রাণী না, মানুষ না?

১৯৪৭-এর ৭ জানুয়ারি সিমসাং—সোমেশ্বরী নদীর এপারে মিলিটারি ঢুকল লেংগুরা, জিগাতলা, চৈতন্যনগর, ভরতপুর গ্রামে। আকাশে হেলিকপ্টার চক্কোর দিতে থাকে। বিদ্রোহী চাষাদের ঘাঁটি খুঁজে বের করবে। দরকারে বম্বিং করবে। নেটিভ চাষাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে যেন সাতপুরুষে আর এই পথে না যায়। প্রভুর হুকুম তামিল করা চাষাদের কর্তব্য। ছোটলোকদের মাথায় তুলতে নেই।

সিনিয়র ব্যাস্টিন, বুড়ো তান্ত্রিক, ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান গ্রাহাম ব্যাস্টিন বলে, সব ওয়াটার বডি ড্রাই করে দে ব্ল্যাকি, নেতারকনা ইজ ল্যান্ড অফ সো মেনি ওয়াটার বডিজ।

কাফ্রি দাস কেন ব্ল্যাকওয়েল, ব্ল্যাকি বলে, ওয়াটার বডি অলরেডি ড্রায়েড স্যার, নো ওয়াটার ইন দ্য হাওর, দিস ইজ উইন্টার সিজিন।

হোয়াট'স হাউর?

বিগ ওয়াটার বডি, লেক। ব্ল্যাকি বলে।

মেক দ্য লেক ড্রায়। হুকুম দেয় বুড়ো ডেমন।

অলরেডি শুখা স্যার, দিস ইজ লেট উইন্টার টাইম।

শীতের দিনে হাওরের জল শুকিয়েছে প্রায়। জন ব্যাস্টিন, সিনিয়র ব্যাস্টিনের দানব, ডেমন ব্যাস্টিন চোখে কম দ্যাখে। বয়স দেড়শো ছুঁই ছুঁই। বিলেতে গ্রাহাম ভিল কাউন্টিতে তাঁর সার্ধ শতবর্ষ পালন করা হবে সামনের বছর। জুনিয়র ব্যাস্টিন তো ফিরে যাবে এদেশের স্বাধীনতার পর। ডেমন ব্যাস্টিন মরেছে অনেক দিন। যখন সে ঘর ছেড়ে ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে এক ক্যাসলের ধ্বংসস্তূপে আশ্রয় নিয়েছিল কাফ্রি দাস নিয়ে, তখন ছিল ফিফটি। দেড়শোর বুড়ো দানব তার দাস নিয়ে নেত্রকোনার আকাশে উড়ছিল। উড়তে উড়তে হাঁফ ধরলে বোঁ বোঁ গর্জন করা হেলিকপ্টারের ঘূর্ণায়মান ডানায় এসে বসছিল। আমাদের কৃষিকর্মের দেশে ডাকিনি ওড়ে ঝাঁটার উপরে বসে, শিল্প বিপ্লবের দেশ, বিলেতে দানব হেলিকপ্টারের পাখায় বসে জগতের অনিষ্ট করে। আবার ডেমন ব্যাস্টিন তার দাস ব্ল্যাকিকে বলে, তাহলে কী করে শাসন করবি আনরুলি পিজান্টদের?

হুজুর, দে আর ব্রেভ। ব্ল্যাকি বলল মিনমিন করে। এই যে বলতে পারল ব্ল্যাকি, আগে কখনও বলেনি। বলার সাহসই হয়নি। এই পুবের দেশে এসে কী যে হয়েছে তার, বলল সাহস করে। বাতাসে কিছু একটা আছে। ব্ল্যাকির এখন নিজ দেশের কথা মনে পড়ে। নিজের গ্রাম। গম আর ভুট্টা, জোয়ারের খেত। ভয়ানক রোদ্দুর, ভয়ানক মেঘ। ধুধু মরু। মরু ঝড়।

ফাক দেয়ার মাদার অ্যান্ড সিস্টার। সিনিয়র ব্যাস্টিন খুনখুনে গলায় গর্জে ওঠে, তুই নেমে যা, মিলিটারির ভিতরে ঢুকে যা, যত ইচ্ছে রেপ কর, রেপ করতে করতে মেরে ফেল।

হুজুর। কাফ্রি বলল, হুজুরের আদেশ, কিন্তু আমার রেপ করার ক্ষমতা নাই, বুড়া হয়ে গেছি স্যার।

ব্ল্যাকির কথা শুনে বুড়ো ডেমন অবাক হয়ে দেখতে থাকে তাকে। এমন হয় নাকি, না, হয় না।

॥ বারো ॥

হয় না, হয় না, মাথা নাড়তে থাকে বুড়ো ডেমন, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলে, ইউ, ব্ল্যাকি বাস্টার্ড, তুই তো জোয়ান মিলিটারির ভিতরে ঢুকে পড়বি, পেয়াদার ভিতর ঢুকে পড়বি, তুই কি নতুন? এই কাজ করিসনি আগে?

ব্ল্যাকি চুপ করে থাকে। তার এতটা কথা বুঝতে চেষ্টা করেনি ডেমন ব্যাস্টিন। ব্যাস্টিনের মাথা গেছে। নাহলে ওই কথা বলা মানে যে ডেমন ব্যাস্টিনের কথা অমান্য করা, তা বুঝতে পারল না ডেমন। আগের দিন হলে ব্ল্যাকিকে ভস্ম করে দিত ব্যাস্টিন। দানবেরও বয়স হয়। দানবের দাসেরও।

ইন দ্য নেম অফ ডেমন ব্যাস্টিন, লেট দেয়ার বি নো মুন, নো সান, লেট দেয়ার বি আ ব্ল্যাক নাইট, কালো রাত্রি নেমে আসুক, ফাক দেয়ার মাদার,অ্যান্ড ডটার, ফাক দেয়ার ওয়াইফ, গ্র্যান্ড মাদার অ্যান্ড গার্ল চাইল্ড অলসো। বিড়বিড় করতে থাকে ব্যাস্টিন দানব।

কাফ্রি দাস মনে মনে বলে, দূর গুয়োরবেটা, এবার পরকালের কথা ভাব, এত রেপ করতে করতে রেপিস্ট মরে যাবে।

আগের দিন হলে ব্ল্যাকি মনে মনেও এইসব বলতে পারত না।

দানব ব্যাস্টিন ঠিক ধরে ফেলত, বুঝে ফেলত তার মনের ভাব। এখন দানবের মরণকাল হয়েছে। দানব মরে কী হয়? কে জানে কী হয়? দানবের কি মরণ আছে? না মরলে বুড়ো হতে হতে হতে, দানবের শক্তি ক্ষয় হতে হতে—, ব্ল্যাকি আর ভাবতে পারে না। অন্ধ, কালা, থুত্থুরে ডেমন ব্যাস্টিন মনের ভিতরে অন্ধকার রাত্রি বয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াবে। তারও সেই হাল হবে একদিন হয়তো। সে মুক্তি চায়। বুড়ো ডেমনকে দেখে তার দাস কেন ব্ল্যাকওয়েল, ব্ল্যাকি বুঝতে পারছিল লোকের অনিষ্ট করার ফল এই। পৃথিবীতে যত অমানিশা রাত্রি এসেছে, সব অমানিশার অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে ঢুকে আছে ব্যাস্টিন ডেমনের ভিতরে। যাই হোক, এবার তাকে মাটির পৃথিবীতে নামতে হবে চাষাদের অনিষ্ট করতে। এই শেষবার। এই যেন শেষ হয় হে প্রভু।

ব্যাস্টিনের হুকুমে কাফ্রি দাস নেমে আসতে থাকে নীচে। পাহাড় জঙ্গল চাষের জমি, হাওর, নদী, ঝোরা, ঝর্ণা, গ্রাম, কুটির, মন্দির, মসজিদ, গির্জার উপর নামতে নামতে ব্ল্যাকি, ব্ল্যাকওয়েলের মনে ভেসে ওঠে বিপরীত চিত্র। তার দেশ। মরুভূমি। কোথাও জলের চিহ্ন নেই। খর্জুর বৃক্ষ, সামান্য ছায়া, হ্রদ, ব্ল্যাকির চোখে জল এসে গেল। যেখানে সে নেমে আসছে বিদ্রোহী চাষাদের দমন করতে, তাদের নারীদের ধর্ষণ করতে, সেই দেশ এত সজীব! বাতাস এত নরম! এত সবুজ ওই পাহাড়ের বন। ব্ল্যাকির দেশে সব নেড়া পাহাড়। তৃণের চিহ্ন নেই। আহা, এত দিনে সে যেন স্বর্গ দেখতে পাচ্ছে। অবাক হতে হতে নামতে থাকে দুরাত্মা ব্ল্যাকি। সে যে বন্দি হয়ে ছিল সিনিয়র ব্যাস্টিন সায়েবের কাছে। কবে তার মরণ হয়েছিল তা আর মনে নেই। মরণের আগে এবং পরে ব্যাস্টিনের অধিকারেই রয়েছে সে। দুরাত্মা হয়েই যেন জন্ম তার। এই যে ব্যাস্টিন বুড়ো তাকে পাঠাল চাষাদের দমন করতে, রক্তহীন করে মেরে দিতে, নারী ধর্ষণ করতে, ব্ল্যাকির কেমন যেন লাগছে। রক্ত পান করতে তার ঘেন্না হয় এখন। ব্ল্যাকির অদ্ভুত লাগছে। চাষারা বিদ্রোহ করতে পারে জমিদারের বিরুদ্ধে, এ কখনও হতে পারে? ব্যাস্টিনের দেশে তো সেবার হল না এমন। চাষারা সবাই প্রভুর পায়ে এসে পড়ল। ব্ল্যাকির মনে পড়ে তার মরুদেশেও তাই। প্রভুর ইচ্ছা সকলের ইচ্ছা। এক প্রভু কিনে এনেছিল তাকে। ব্যাস্টিনের মতোই শ্বেতাঙ্গ প্রভু। ঈশ্বর। হাতে পায়ে শেকল বেঁধে জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে এল ব্যাস্টিনের দেশে। সেই প্রভু ডেভিড সায়েব খুব বেত্রাঘাত করত নিয়ম-বেনিয়ম, যা কিছু হলেই। বেত মারতে ভালোবাসত প্রভু ডেভিড। ডেভিডের কাছ থেকেই ব্যাস্টিন প্রভু তাকে কেনে। কিনে তাকে শেখায়, কিল, কিল, কিল, খতম করতে শেখ, টরচার করা শেখ ব্ল্যাকি। ভয় দেখিয়ে খতম করে দিবি খতরনাক চাষাদের। এই নে চাবুক। আমি হুকুম করলেই চাবুক মারবি। চাবুক মেরে একটা-দুটো খতম করতে পারলেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। রেভিনিউ দেবে। ব্যাস্টিন তাকে নিয়ে যায় সেই ভগ্ন দুর্গে। তার সাধনার সঙ্গী করে। চাষাদের খতম করতে শেখায়। কোথায় মারলে ঘাড় মটকে পড়ে থাকবে বুঝিয়ে দেয়। ইভিল স্পিরিট গ্রাহাম ব্যাস্টিনের কাছে মানুষ খতম করা শিখেছে ব্ল্যাকি। ভাসতে ভাসতে সে নেমে এল এক ভিটের পিছনে বাগানে। সুপুরি বন। লম্বা লম্বা গাছ অন্ধকার আকাশ ছুঁয়েছে। তার পাশে কাঁটালো বন। ডেমন ব্যাস্টিনের অনুচর ব্ল্যাকির মনে পড়ল একবার গ্রাহাম ভিলে এক দুষ্ট কৃষকের আঙুর বাগান নষ্ট করে দিয়েছিল ডেমন ব্যাস্টিনের হুকুমে। ব্যাস্টিন কী এক পাউডার দিয়েছিল, তা আঙুর লতার গোড়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল সে। আঙুরলতা শুকিয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। ব্যাস্টিন একবার একটা পুকুরের সব মাছ মারতে ওষুধ দিল তাকে। পরদিন সব মাছ মরে ভেসে উঠল। একবার স্ট্রবেরি বাগান ধ্বংস করে দিল ওষুধ দিয়ে। সব করেছে ব্ল্যাকি, হুকুম করেছে ব্যাস্টিন। আজ যেমন এসেছে রেপ করতে। তার তো হাওয়ার শরীর, কিন্তু মিলিটারি, পুলিসকে উত্তেজিত করে রেপ

বজবজ পৌরসভা

প্রগতির পথে বজবজ
সুয়ারেজ নেটওয়ার্ক ও এসটিপি র কাজ চলছে।
৫০০ আসনযুক্ত অডিটোরিয়াম
গ্রীন সিটি প্রকল্প
হাউস ফর অল, টার্গেট ৪৫৯
প্রতি বাড়ি কস্ট ৩৬৮ লাখ।
হাউস ফর আরবান পুওর, টার্গেট ৫০
প্রতি বাড়ি কস্ট ২.৯৬ লাখ।
গীতাঞ্জলী হাউসিং স্কীম ফর EWS
টার্গেট 50 + 14 কস্ট 90000 প্রত্যেক
এছাড়া রাস্তা, ড্রেন, গার্ডওয়াল, শ্মশানঘাট
ও কবরস্থান সংস্কার এর কাজ চলছে।

গৌতম দাশগুপ্ত
উপ পৌরপ্রধান

মুকুল দে
পৌর প্রধান

মহেশতলা পৌরসভা
পৌর পরিষদ কার্যালয়
পোঃ- মহেশতলা, জেলাঃ- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিনঃ-৭০০১৪১
ওয়েবসাইটঃ- www.mahesholamunicipality.org
দূরভাষঃ- ২৪৯০-২২৮০/১৬৫১/৬৬৮৯
ইমেলঃ- mahesholamunicipality@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি
• নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
• নিয়মিত ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ করুন।
• প্লাস্টিক বর্জন করুন এবং পরিবেশ এর ভারসাম্য বজায় রাখুন।
• ডাস্টবিনে জঞ্জাল ও আবর্জনা ফেলবেন না।
• পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করুন।
• ডেঙ্গু নিয়ে অযথা আতঙ্ক না সতর্ক থাকুন এবং ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর পাওয়া মাত্রই পৌরসভার স্বাস্থ্যবিভাগে জানান (ফোন নং - ৮৭৭৫২১১৭৫)

জনাব আবুবাকের মোল্লা
উপ-পৌরপ্রধান

মৃণালকান্তি
পৌরপ্রধান

বারুইপুর পৌরসভা

মা-মাটি-মানুষের পৌরসভা বারুইপুর পৌরসভা সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং আগামীদিনেও থাকবে। সার্ধশতবর্ষে বারুইপুর পৌরসভা বারুইপুরের সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলার অগ্নিকন্যা তথা মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

শ্রীগৌতম কুমার দাস
উপ-পৌরপ্রধান
বারুইপুর পৌরসভা

ধন্যবাদ সহ:-
শ্রী শক্তি রায়চৌধুরী
পৌরপ্রধান-বারুইপুর পৌরসভা

ভদ্রেশ্বর পৌরসভা
ভদ্রেশ্বর হুগলী

ভদ্রেশ্বর পৌরসভা পরিচালিত অম্বুজ হসপিটালে HD Unit Dialysis Unit-এর পাশাপাশি নবরূপে ICU ও Maternity বিভাগ চালু হয়েছে।

সকলকে জানাই পৌরসভার পক্ষ থেকে শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রলয় চক্রবর্তী
পৌরপ্রধান
ভদ্রেশ্বর পৌরসভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটানো তার কাজ। বুড়ো ব্যাস্টিনের কথায় এক চাষার বউকে রেপ করেছিল সে গ্রাহাম ভিলে। চাষা এসে ব্যাস্টিন সায়েবের পায়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে কাজ তো ব্যাস্টিনের হুকুমে। সুপুরি গাছের গোড়ায় বসে ব্ল্যাকি ভাবতে লাগল কী করবে? আকাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায় ছেয়ে আছে সব। আকাশ থেকে হেলিকপ্টারের সঙ্গে চলে গেছে ব্যাস্টিনবুড়োর দুরাত্মা। ব্ল্যাকির ভালো লাগছিল এই বন এই পাহাড়। কতদিন সে এমন মাটি, এমন গাছ-গাছালি, এমন বাগানে নেমে আসেনি। স্যার ব্যাস্টিন শুধু আকাশে ঘোরে। স্যার ব্যাস্টিন শুধু মানুষ আর প্রকৃতির অনিষ্ট করবে কীভাবে, তা নিয়ে ভাবে। স্যার ভাবে বলে সেও ভাবে। স্যারের পরিমণ্ডলে থাকলে তাই-ই হবে। নইলে তার নিজের ইচ্ছে হয় না ভাবতে। এখন যেমন ভাবছে না। ব্যাস্টিনের পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। ব্যাস্টিন তাকে ইভিল বানিয়েছে। কত হত্যা, কত ধ্বংস, কত ধর্ষণ করেছে সে। সুপুরি বনের ভিতর বসে, মাটি ছুঁয়ে থেকে ব্ল্যাকির মনে হল, বুড়ো ব্যাস্টিনের কথা সে আর মানবে না। মরণের আগে ও পরে তার কথায় উঠেছে বসেছে, এখন আর না। এই সুপুরিবাগান, দূরের গারো পাহাড়, বনভূমি, সিমসাং নদী, হাওর, কংস নদী, শালবন সব তার নবজন্ম দিল যেন। বুড়ো ব্যাস্টিন খুব ভুল করেছে। বুড়ো ব্যাস্টিন জানত না, এই দেশ মন্ত্র-তন্ত্রের দেশ। বন, পাহাড় গাছ-গাছালি, ফুলের বাগান, সুপুরি বাগান, নদী, হাওর— সব মন্ত্র জানে। কালেক্টরের কেরানি গুরুপদ না, আসলে সেই মন্ত্র জানে মাঠ-পাথর, নদী আর বন। আহা! মানুষের কত সর্বনাশ করেছে সে। ব্ল্যাকির চোখে জল এসে গেল। সে মনে মনে ঠিক করে নিল এই দেশে থেকে যাবে যতকাল না তার মুক্তি হয়। মুক্তি না হলে না হবে, সে নিজে বিদেহী, এই সুপারি বাগানে ঘুমিয়ে থাকবে। তার ঠাকুরদা বুড়ো সমস্ত দিন শুধু খাটিয়ার উপর পড়ে থাকত। পড়ে থেকে থেকে একদিন মরে গেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে গেল। সে মরেছে একবার। কিন্তু মরেও মরেনি। ডেমনের দাস হয়ে আছে। ব্ল্যাকি বাগানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কত নিশ্চিন্ত ঘুম তার। সেই ঘুম ভাঙল টুপ করে। কীসের শব্দ? না সুপুরি গাছের পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ল শিশির। শিশিরের ছোঁয়ায় সে উঠে বসল। সূর্যোদয় হচ্ছে নদীর ওপারে। ব্ল্যাকি শুনল মিলিটারির বুটের পদধ্বনি। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে। ভোর সকালেই মিলিটারি যাত্রা করেছে দুর্বিনীত চাষাদের দমন করতে।

কালেক্টর বলছে, টঙ্ক প্রথা চালুই থাকবে। হয় ধান না হয় টাকা দিতেই হবে। মণি সিংকে দেখতে পেলেই গুলি। মেরেই ফেলে দেওয়া ঠিক হাজং নেতা ললিত সরকার এবং কমিউনিস্ট মণি সিংকে। পরে বলা যাবে সংঘর্ষে মারা গেছে। বিদেহী ব্ল্যাকি জানতে পারে। সে শুনতে পায় জহির উদ্দিন মুন্সি, মৌলবী আবদুল হান্নান, ক্ষিতীশ সরকারদের নাম। শুনতে পায় রাশিমণি, ভদ্রমণি, কুমুদিনী, অশ্বমণি, কলাবতী, স্বরূপা। পুরুষদের নাম গেল, বিপিন, মঙ্গলচাঁদ, কাঙাল, বল্লভী বক্সী আর লঙ্কেশ্বর হাজংয়ের নাম। এদের দেখতে পেলেই মেরে দিতে হবে। লাশ পড়লেই চাষারা শান্ত হয়। আর এদের বউ-মেয়েকে ধর্ষণ করতে হবে মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে। প্রজা শাসনের এই হলো আসল পদ্ধতি। ডেমন ব্যাস্টিন এবং তার প্র-পৌত্রের শাসনে এমনই হবে। ব্ল্যাকি বাতাসে ভেসে চলল। গেল লঙ্কেশ্বর হাজঙের বাড়ি। চিনল কী করে? বলা যাবে না। খবরিয়া বানেশ্বরের খবর ডেমন ব্যাস্টিনের কাফ্রি দাস, ব্ল্যাকওয়েল, ব্ল্যাকি, লঙ্কেশ্বর হাজঙের ঘুম ভাঙিয়েছিল দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে।

শুনতে শুনতে রুমি বলে, গারো রাজার কাছে যে হলুদ পঙ্খি গিয়েছিল, তার পূর্বজন্মের স্বামী খবরিয়া বাণেশ্বর?

অতীন বলল, তাই লেখা আছে।

রুমি বলল, এই পালাডা কি হলুদ পঙ্খি পালা?

এই পালা মৈমনশাহী উপাখ্যান।

বাণেশ্বর খবরিয়া ছিল সেখানে? ঝুমি জিজ্ঞেস করে, সেই সুপারি বনে?

খবরিয়া কোথায় না থাকে? বললেন অতীন।

তখন হলুদ পঙ্খি মানুষ ছিল? ঝুমি জিজ্ঞেস করল।

অতীন বললেন, তাই-ই তো লেখা আছে।

আহা, তহন কী সুন্দর দিন ছিল স্যার। ঝুমি বিড়বিড় করল।

রুমি বল্লল, তুই এবার চুপ কর, স্যার আপনি পালার গল্প শুনান।

ঝুমি বলল, বাণেশ্বর খবরিয়া যদি থাকত এখন, সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধর খবর ঠিক জানা যেত।

তুই থাম, ওসব কেউ নাই, বাবার ভুল। বলল রুমি।

বাবার ভুল কেন হবে, শুধু বাবারে দুষিস কেন? বলল ঝুমি।

বাবা মোটেও যায় না তাদের খুঁজতি, বাবার কেউ আছে, তার নিকট যায়। রুমি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল।

ঝুমি রেগে গিয়েও রাগ সামলে বলল, তুই দিন রাত আজাইরা কথা নিয়া ঘুরিস, কার কাছে যায় বাবা?

রুমি বলল, বলি, বলেই ফেলি,

নাকের নথ বেচ্যা বিবি আষাঢ় মাস খাইল।
গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল।।
শাওন মাসেতে বিবি পায়ের খাড়ু বেঁচে।
এত দুঃখ সেই বিবির কপালেতে আছে।।

ঝুমি বলল, এ তো পেরায় মলুয়া পালার কথা।

না, রুমি বলল,

বিবির দুঃখে কাতর হইয়া আসে সাইকিলিয়া।
চাউল ডাইল মৎস্য মিঠাই দুগ্ধ রং লিয়া।।

এক বিবির সোয়ামি গেছে আকাম করতে ঢাকা শহরে, সেথায় এক বিয়া করে ঘরে ফেরে নাই, বাবা গোপাল দাস তার দুঃখে কাতর হয়েছে, সাইকেল নিয়া ছোটে ওই কারণে, মা ওই দুঃখে মলো, আগে মাসির বাসায় যেত বাবা, এখন এই বিবির বাসায় যায়। বলল রুমি, সেই কারণে আমাদের বিবাহ দিয়ে বাবা নিষ্কণ্টক হবে। বাবার ভিতরে শুধু ছোঁক ছোঁক, মাছের গন্ধে যেমন বিলাই ঘোরে।

ঝুমি গুম হয়ে যায়। তার সহ্য হচ্ছে না এসব কথা। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা লোকটা উদাসী হয়ে গেছে। সব কাজে ভুল করে। দরকারি কথা ভুলে যায়। রুমি সব মিথ্যে বলছে। ভগবান শুনছে সব কথা। পাপ হবে তোর দিদি। এসব যখন ভাবছে ঝুমি, কথা আবার আরম্ভ হয়।

ঘুমের ভিতর লঙ্কেশ্বর হাজং স্পষ্ট শুনতে পায় বুটপরা পায়ের শব্দ। মার্চ করছে সেনাবাহিনী। এই শব্দ সে চেনে। যবে থেকে তারা টঙ্ক বিরোধী হয়েছে, তবে থেকে কালেক্টরের এই বুটপরা সিপাই-সান্ত্রীর পায়ের শব্দ ঘুমের ভিতরেও চিনতে পারে। মণি সিং বলে দিয়েছে কী করে চিনতে হয়। বিপ্লবীর এসব বুঝতে হয়। ঘুমের ভিতরেও তাকে সজাগ থাকতে হয়। ঘুমের ভিতরে তাকে স্বপ্ন দেখতে হয়। সেই স্বপ্নই সে দেখেছে। মিলিটারি আসছে। বাহিনীকে পথ দেখিয়ে আনছে পুলিসের খোঁচড় এক। ঘর চিনিয়ে দেবে। লঙ্কেশ্বর ঘুম থেকে জেগে উঠেই তার নতুন বউ কুমুদিনীকে বলল, মিলিটারি আসে, কী দেখলাম বউ।

কী দেখেছ তুমি? কুমুদিনী জিজ্ঞেস করে।

মিলিটারি আসতেছে।

স্বপ্ন দেখেছ, স্বপ্নের কোনও মানে নেই। কুমুদিনী বলে।

না বউ, মিলিটারি সিমসাং নদী পার হচ্ছে নৈকো করে, বলতেছে টঙ্ক যারা দিবে না, তাদের ধরবে আগে, ধরে হাতি-চিপা করে মারবে। বলল লঙ্কেশ্বর, আমি বিপ্লবী, আমি ভুল স্বপ্ন দেখিনি।

কুমুদিনী বলে, স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

হয়। বলল ব্ল্যাকি। কুমুদিনীর কানে কানে বাতাসে ভেসে। কুমুদিনী চমকে উঠেও ভাবল ভুল শুনেছে কিংবা তার স্বামীর গলা শুনেছে। কিন্তু স্বামীর গলা তো এমন নয়। তবে কে, কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে এই সকালে? বিভ্রান্ত হয়ে সে এদিক-ওদিক কুয়াশার দিকে তাকিয়ে দেখল। কেউ কি কুয়াশার ভিতরে ঢুকে গেল?

॥ তেরো ॥

না। কুমুদিনী বুঝল তার ভুল। তার স্বামী লঙ্কেশ্বর কথা বলছে। বলছে, খুব বিপদ বউ, আমি পলাই, আমারে ধরতে আসে মিলিটারি-পুলিস, পথ দেখাইছে নিতু হাজং, মুখে গামছা বাঁধা, কিন্তু আমি চিনেছি, কে যেন ডাক দিল আমারে, নিতু হাজঙেরে চিনে নাও, সিমসাং নদী পারায় নাও। হায় হায়, সে আসলে পুলিসের চর, বুঝতে সময় লেগে গেল।

তুমু কি মনে করো স্বপ্নে যা দেখেছ, সব সত্যি? উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল কুমুদিনী।

মনে হচ্ছে তা। লঙ্কেশ্বর বলে, না হলে স্বপ্ন দেখছি কেন?

ব্ল্যাকি ভাবল, হায় হায়, বউটারেও স্বপ্ন দিয়া উচিত ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। বউ জেগে উঠেছিল আগেই। গাঁয়ের চাষা-বউ। ভোর থেকেই তার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। উঠোন ঝাঁটানো, গোবর-ছড়া দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা, গোরু দোয়ানো, গোরুকে জাবনা দেওয়া—এত সব করতে ভোরেই উঠতে হয়।

ব্ল্যাকি আবার বলল, পলাও লঙ্কসর।

কুমুদিনী চমকে উঠল, এই কথাটা বলল কে। কেউ নিশ্চয়। কিন্তু সে তার স্বামী না। তাহলে? সে কী ভেবে জিজ্ঞেস করল, কেউ পলাতি বলল?

সে কেডা আমি জানিনে, স্বপ্নের সব কথা মনে থাকে না।

না, এখন বলল না কি? বিড়বিড় করল কুমুদিনী। বুঝতে পারছে না সবটা ঠিকঠাক। মনের ভুল!

তাহলে করব কী? লঙ্কেশ্বর জিজ্ঞেস করল, বলল, পষ্ট দেখিছি বউ, মিলিটারি আসতেছে আমারে ধরতে, মণি সিং বলেছে, স্বপ্ন না দেখলে বিপ্লব হয় না, আবার স্বপ্ন এমনি ভাবে বিপ্লবীরে বাঁচায়।

কুমুদিনী বলে, সত্যি মিথ্যে জানিনে, ধরা দিলে চলবে না, তুমি বনের ভিতরে গিয়ে লুকাও।

লঙ্কেশ্বর হাজং বলে, তাইলে তুই আমার সাথে চ' বউ।

আমারে কি স্বপ্নে দেখেছ?

লঙ্কেশ্বর হাজং বলল, না, দেখি নাই।

তাহলে, আমি যাব না, রাশিমণি মাসির ভিটায় মিটিন আছে, সেই থনে যাব, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সভা, সব লোকে থাকবে। বলল কুমুদিনী।

লঙ্কেশ্বর বলে, আমি না পলায়ে দেখি ওরা কী করে, স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

এখন কুমুদিনী উল্টো কথা বলল, হয়, নইলে কেন দেখিস স্বপ্ন?

না গেলে কী হবে? লঙ্কেশ্বর জিজ্ঞেস করে বউকে। কিন্তু বউ কী করে জানবে তা তার মনে এল না। বউ তার ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে জবাব দিল, কী হবে তা স্বপ্নে কি দেখ নাই?

তুইও কি তাহলে স্বপ্ন দেখেছিস? লঙ্কেশ্বর জিজ্ঞেস করে উদ্বিগ্ন হয়ে।

কথা বলার সময় নাই, তোমারে ধরে নিয়ে যাবে, হাতির পায়ের তলায় চিপে দিবে। কুমুদিনী ভয়ার্ত গলায় বলল, তুমি পলাও।

লঙ্কেশ্বর বলে, হু, ওরা খারাপ মানুষ, নিঠুর, কিন্তু আমি একা পলাব?

হ্যাঁ, তুমি পলাও, মিলিটারি চলে গেলে ফিরে আসবা, পাহাড়ের দিকে চলে যাও।

লঙ্কেশ্বর বোঝে কুমুদিনীর কথা ঠিক। মিলিটারি ধরলে মেরেই দেবে। ময়মনসিংহর কালেক্টর দানবের মতো মানুষ। অত্যাচারী শাসক। দয়ামায়া নেই মনের ভিতর। মিলিটারি নামিয়েছে লাশ ফেলতে। হু, খারাপ মনুষ্য, পলাও। তার কানে কানে বলে দিল ব্ল্যাকি। খুনে লোক, পলাও। কে বলল, কেউ না। কিন্তু কেউ তো বলল। লঙ্কেশ্বর ভাবে দুঃস্বপ্নের ঘোর রয়েছে এখনও। ব্ল্যাকি বুঝতে পারছে কী হতে পারে। ব্ল্যাকি এসেই ঘুম ভাঙিয়েছে এদের। লঙ্কেশ্বর চারপাশ দ্যাখে। কেউ নেই। মিলিটারি এসে গেল নাকি? এসেই গেল প্রায়। লঙ্কেশ্বর গৃহত্যাগ করল। দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে কুমুদিনী। কুয়াশায় ঢুকে মুছে গেল লোকটা।

লঙ্কেশ্বর চলে যেতে ব্ল্যাকি নিশ্চিন্ত হল। বুক ভরে মানুষের মতো শ্বাস নিল যেন। একটা কাজ করতে পারল। তার ক্ষমতা আছে। সবটা দুরাত্মা হরণ করে নেয়নি। ব্ল্যাকি এবার বসল হাতনেয়। কুমুদিনী খুব কাজের মেয়ে। ব্ল্যাকি কুমুদিনীর কাজ দেখতে থাকে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স। খুব খাটতে পারে। ব্ল্যাকির মনে হল, সে যদি মিলিটারির কেউ হতো, সে কী করত, না, পুরুষমানুষ না পেয়ে মেয়েমানুষ তুলে নিয়ে যেত। আবার পুরুষটাকে পেলেও, তার বউকেও তার সঙ্গে তুলে নিয়ে গিয়ে একজনকে রেপ করত, অন্যজনকে পিটাত। তাইই তো। আগের কালে কী হতো, তার মরণের আগে কী হতো, একা মেয়েমানুষ দেখতে পেলেই বনের ভিতর টেনে নিয়ে যেত। ডেমন ব্যাস্টিনের হুকুম ছিল তাই। অবাধ্য চাষাঘরের মেয়েদের রেপ কর আর মেরে ফেল। এতেই সব জব্দ হবে। এবার তাকে ডেমন ব্যাস্টিন বলেছে, মিলিটারির ভিতরে ঢুকে গিয়ে মেয়েমানুষের উপর অত্যাচার করতে। এমন সে করেছে কত। কিন্তু তখন সে ছিল বাধ্য। বুড়ো ডেমন বুড়ো ছিল না। হুকুম করত। রেপ দেখত পাশে দাঁড়িয়ে। বুড়ো ডেমনের তাতেই ছিল উল্লাস। কুমুদিনীকে দেখতে দেখতে ব্ল্যাকির মনে হল বুড়ো ডেমন থাকলে নিজেই ঝাঁপাত। হায়, তার যে নিজের দিদির কথা মনে পড়ে গেল। সে তখন বালক। দিদি জুলিয়া এমন ফর্সা ছিল না বটে, ঘোর কালো, অমাবস্যার রাতের মতো উজ্জ্বল-কৃষ্ণ। কিন্তু এমনিই ছিল যেন। ব্ল্যাকির চোখে জল এল। স্যারের হুকুমে কত ধর্ষণ করেছে সে। বন্দুক তাক করে জুলিয়াকে রেপ করেছিল পরপর তিনটে সাদা মানুষে। তারা তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কতকাল বাদে জুলিয়ার কথা মনে পড়ল এই কুমুদিনীকে দেখে। আগে কখনও এমন মনে হয়নি তো। সে এখন কুমুদিনীকে পাহারা দেবে। তার মন বলছে মিলিটারি ছাড়বে না। মিলিটারি একে ধরবে। তখন একটা বুড়ি ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘরের বাইরে এল, ও বউ, তোর সোয়ামীরে কোথায় পাঠালিরে ভর সক্কালে? বুড়ি হল লঙ্কেশ্বর হাজংয়ের মা।

স্বপ্নে মিলিটারি দেখেছে সে। বলল কুমুদিনী, সে পলাইছে পাহাড়ের দিকে।

স্বপ্ন দেখেছে বলে পলাতে হল, সত্যি এইছে মিলিটারি? বুড়ি জিজ্ঞেস করে।

ব্ল্যাকি বলল, সত্যি।

কেডা বলল সত্যি, ও বউ?

কুমুদিনী ফিরল, সত্যি হতে পারে, কাল বিকালে উড়াকল দেখ নাই আকাশে?

দেখেছি, তার মানে কি মিলিটারি আসা ?

ব্ল্যাকি বলল, হ্যাঁ, মিলিটারি আসা।

চমকে উঠে বুড়ি চুপ করে। গলার স্বর তো বউয়ের মতো না।

তখন মিলিটারি পার হয়ে এসেছে সিমসাং নদী। মিলিটারি এসেছে হাজং নেতাদের ধরতে। কিন্তু মিলিটারির যে প্রধান কাজ, আতঙ্ক তৈরি করা, তা করতে হবে তো। আতঙ্ক না তৈরি করতে পারলে চাষারা থামবে না। বুটপরা মিলিটারির পা কৃষক সমিতির অফিস ভাঙল। গুঁড়িয়ে দিতে লাগল সব। এতদিন তারা কৃষকদের ধরে ধরে পিটিয়ে গাড়িতে তুলেছে। তারপর কঠিন কঠিন ধারায় মামলা জুড়েছে। হাজতে চোরের মার মেরেছে দারোগা পুলিস। হাতি পিষা করে দেবে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে চাষারা দমেনি। সেই কারণেই তো আকাশে বিমান পাঠাল কালেক্টর জন ব্যাস্টিন। কালেক্টর ব্যাস্টিনের রোখ চেপে গেছে। তার ভিতরে প্রভু-জমিদারের রক্ত জেগে উঠেছে। দেশ ভিন্ন হলে কী হবে, চাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাষাই। তারা মাথা তুলবে কেন? চাষাদের বিদ্রোহ দমন করে সে ইংল্যান্ড ফিরবে। গারো পাহাড়ের কোলে, সুসঙ্গ পরগনার আকাশে বোঁ বোঁ চক্কোর মেরে হেলিকপ্টার ফিরে গেছে। কিন্তু তাতে কি চাষারা ভয় পেয়েছে খুব? বোঝা যায় না। একে শীত, তায় কুয়াশা কুয়াশা ভাব। রোদ ওঠে না। উড়োকল, হেলিকপ্টার বনবন করতে করতে, ভীষণ আওয়াজে গারো পাহাড় কাঁপাতে কাঁপাতে ফিরে গেছে গত বিকেলে। যারা খবর রাখে তারা মনে মনে গেয়েছে, হায় হায় হায়! আবার কি যুদ্ধ লাগল? জাপান আবার জেগে উঠল অত মৃত্যুর পর। সত্যিই যুদ্ধ কি শেষ হয় নাই? কিন্তু পদাতিক সশস্ত্র পুলিস গতকাল চোঙা ফুঁকে ফুঁকে বলেছে, কালেক্টর বিমান পাঠিয়েছে, বোমা মেরে চাষাদের জব্দ করে দেবে। বম্বিং হবে যদি টঙ্ক না দিয়া হয়।

ধান দাও, টঙ্ক দাও,/ না দিলে গুলি খাও।
ব্যাস্টিন সায়েবের খুব রাগ,/ দিতেই হবে ভাগের ভাগ।।

যখন মিলিটারি মার্চ করছে বহেরাতলী গাঁয়ে, তখন ব্ল্যাকি বুড়ির পাশে এসে বসল। বুড়ি পাশ ফিরে তাকায়। এমনিই তাকায়। চোখে কিছু দ্যাখেই না প্রায়। সব ঝাপসা ঝাপসা লাগে। ঘুম ঘুম লাগে। সে কিছু না দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, ও বউ, বউ, বেটা কদ্দূর গেল?

কুমুদিনী বলল, বনে গিয়েছে মা।

বুড়ি বলল, কেউ এয়েছে নাকি ?

কেডা আসবে? কুমুদিনী বলল। বলল বটে, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল কেউ এসেছে যেন। কেউ এলে যেমন মনে হয়, তেমনি মনে হচ্ছে। সে চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিল। কই, কেউ তো নেই। সকালে তো চোর আসবে না। কিন্তু কেউ যেন রয়েছে ভিটেয়। যেমন সমুখে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় পিছনে কেউ আসছে, পিছনে কেউ আছে, তেমনি। কেউ যেন বলল, যা মিটিনে যা।

যাব, ভাত রেঁধে যাব, লোকটা ঘরে ফিরলে, মুখে দুটা ভাত দিতে হবে তো, শাউড়ির ভাত ঘরে রেখে যেতে হবে তো। নিজের মনে বলল কুমুদিনী।

ও বউ কারে কী বলিস? বুড়ি বলে উঠল।

কুমুদিনীর আগে ব্ল্যাকি বলল, তোমারে বলে।

বুড়ি বলল, তুমি কেডা?

জবাব দিল না ব্ল্যাকি। সে বসেছিল হাতনেয়, বুড়ির কাছেই। সে দেখছিল, উঠোনে ফুলের ঝাড়। হলুদ রং ঝিমঝিম করছে। এমন রঙের বাহার কতকাল দেখেনি ব্ল্যাকি। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এ ফুল কী ফুল গো বউ?

চমকে উঠল কুমুদিনী। তার শাউড়ি কি চোখে দ্যাখে? যদি দ্যাখে, গাঁদা ফুল চেনে না? জানে না উঠোনে কোন ফুলের চারা আছে, গাঁদা, জবা, দোপাটি, মোরগঝুঁটি, কলাবতী। যখন চোখ ছিল ভালো, কোমর পড়েনি, বুড়ি নিজেই তো গাছে জল দিত, ফুল তুলত। লঙ্কেশ্বরের ঠাকুরদা, তার শ্বশুর করত হাতি খেদার পাঞ্জালীর কাজ। পাঞ্জালী সেই লোক যে তাড়িয়ে আনা হাতিকে বাঁশ আর শাল-বল্লী দিয়ে গড়া দুর্গের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত করে। পাঞ্জালীর কাজ করতে গিয়ে চাষের কাজ হতোই না। সময়ই হতো না। হাতি খেদা করতে করতেই মরেছিল লোকটা। এসব বলে গেছে বুড়ির শাশুড়ি। সে কবে মরে গেছে তা আর মনে নেই। কুমুদিনী বলে উঠল, মা তুমি কি একেবারে চোখে দেখ না?

বুড়ি কথাটা শুনল না, বিড়বিড় করতে লাগল,

গারো পাহাড় গারো পাহাড়,/ সিমসাং নদী সরছে
টঙ্ক আর ধানের টঙ্কা/ না দিব তা কইছে।।

ব্ল্যাকি শুনতে শুনতে বলল, টঙ্ক দিবে না, কী দিবে?

কেনে ধান দিব ভাগের ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ। বুড়ি বলল, ও বউ তুই তো বললি, তিন ভাগের দুই ভাগ চাষায় পাবে, এক ভাগ রাজায় নিবে।

বউ কুমুদিনী বলল, কেনে কী হয়েছে, টঙ্ক দিয়া হবে না, তেভাগার দাবিই হয়েছে, মণি সিং তাই কয়েছে, মাসি রাশিমণি তাই কয়েছে।

তবে যে জিগাস করিস? বুড়ি বলল।

কী জিগাস করি?

টঙ্কের কথা! বিড়বিড় করতে করতে বুড়ি চুপ করে যায়। বুঝতে পারছে না কিছু। তার কানে তখন কেউ বলল, টঙ্ক দিবে না, না না না।

বুড়ি বলল, আচ্ছা, দিব না, দিব না দিব না।

ব্ল্যাকি ডাকল, সত্যি দিবে না?

না দিব না, বলছি তো দিব না।

ব্রেভ লেডি, ডর লাগে না? ব্ল্যাকি জিজ্ঞেস করল।

বুড়ি বলল, ডরাব কেনে, আমার বাপে, আমার শউরে হাতিখেদা করতি গে মরিছিল, কীসে ডরাই! বুড়ির চোখদুটি কথার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠতে লাগল। ব্ল্যাকির যে কী মনে হয়। এই বুড়ি যেন চেনা মুখ। সেই যে সেই মরুভূমির দেশের কথা মনে পড়ে ব্ল্যাকির। তার গ্র্যান্ড মাদার এমনি বলত। ঠাকমা তোমার ভয় করেনি, সায়েবরা যখন মানুষ ধরে চালান করতে এল চোখ রাঙিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে।

॥ চোদ্দো ॥

ব্ল্যাকি বসে আছে বুড়ির পাশে। কুমুদিনী চুলো ধরিয়েছে। সে দুহাত না, দশ হাতে কাজ করে। আজ বিপদের দিন। আজ কাজের তাড়া বেশি। বুড়িকে নিশ্চয় মিলিটারি কিছু করবে না। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের নেত্রী রাশিমণির বাড়ি যাবে। তার কানে আসছে, বুড়ি নিজ মনে বকম বকম করছে। এমন তো বকে না বুড়ি। বুড়িও কি স্বপ্ন দেখেছে?

বুড়ি বলছে, সক্কালে বেটা না খেয়ে কোথায় পলাল?

ব্ল্যাকি বলে, ভালো হয়েছে।

তুই তো আছিস, তবে সে গেল কেন?

আমি তো এখেনের মানুষ না।

তাহলে তুই কেডা, পুলিস, মিলিটারি, গুমস্তা, আমিন?

আমি ব্ল্যাকি।

বুড়ি বলল, বুঝা গেল না, বাঁকি?

ব্ল্যাকি বলল, ব্ল্যাকি, কালো মানুষ তো, কালোরে ব্ল্যাকি বলে সায়েব আদর করে।

সায়েব নিব্বংশ হোক, মানষের আবার সাদা কালো কী? বুড়ি বিড়বিড় করে বলে।

ব্ল্যাকি বলল, আমার দেশে এত গাছ, এত পানি নাই, আমার বাপে চালান হই গিছিল ব্যাস্টিনের দেশে। বলল ব্ল্যাকি, আমি চালান হই গিছিলাম প্রভু ডেভিডের কাছে।

মানুষ চালান হই গিছিল? বুড়ি জিজ্ঞেস করে অবাক হয়ে।

ইয়েস, মাদার, আমি চালান হওয়া মানুষ। ব্ল্যাকির স্তিমিত আর দুঃখিত কণ্ঠস্বর, লোহার শেকলে বেঁধে জাহাজের খোলে ফেলে নিয়ে গিছিল।

বাপ আর ফিরেনি? বুড়ি জিজ্ঞেস করে।

নো, নো রিটার্ন। ব্ল্যাকি জবাব দিল।

বুড়ি ইংরেজি জানে না, কিন্তু বুঝল, আহা রে বাপ, বাপের মুখ আর দেখিসনি?

ব্ল্যাকি বলল, আই হ্যাভ ফরগোটেন হিজ ফেস।

দুর্ভাগা, ঘর কুথায় হলো? বুড়ি হাত বাড়িয়ে তার গা ছুঁতে চায়, পায় না কিছুই। হাওয়ায় হাত ঘুরে এলে বুড়ি জিজ্ঞেস করে, কই গিলি বাপ?

আমি আছি, আছি। ব্ল্যাকি উত্তর দেয়।

কুথায় আছিস? বুড়ি হাত ঘোরায়, হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, বললি নে ঘর কোন গাঁয়?

আই ডোন্ট নো। ব্ল্যাকি বলল।

গারো পাহাড়ের ওপারে? বুড়ি বেশ বুঝতে পারছে ব্ল্যাকির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা, সেই ছমাস হেঁটে হিমানি পর্বত, তারপরে ছমাস হেঁটে সপ্ত সমুদ্দুর, সে আঁধারঘেরা দেশ?

ব্ল্যাকি বলল, কান্ট রিমেম্বার, কিন্তু সে দেশে খুব আলো, আঁধার নাই।

আহা রে, আঁধার নাই, শুধু আলো, কোন দেশ মনে নাই, ইহ জম্মে আর দেখা হবেনি। বুড়ি তার চোখ মুছল।

ব্ল্যাকি বলল, হবেন না, আই নো নাথিং অ্যাবাউট মায় কান্ট্রি রোড, মায় ভিলেজ।

বুড়ি বলল, গুয়োরবেটাদের ভালো হবেনি।

ব্ল্যাকি বলল, বউরে বলো মিটিংয়ে যেতে।

ও বউ তুই মিটিনে যাবি? বুড়ি ডাকল কুমুদিনীকে।

যাব তো। কুমুদিনী চুলোর ধোঁয়া থেকে চোখ আড়াল করতে করতে উত্তর দেয়।

তাহলি যা। বুড়ি বলল।

কাজ সেরে যাই, তুমু ফেনে ভাত খাবা তো। কুমুদিনী বলল।

বুড়ি বলল, চালভাজা দিয়ে যা, আমার মনে হচ্ছে, তোর এখন মিটিনে যাওয়া দরকার।

ভাত চাপালাম। কুমুদিনী বলল, নামিয়ে রেখে যাব।

তখন ব্ল্যাকি বলল, নো নো নো, মিলিটারি ইজ কামিং, গো, গো, গো, মিলিটারি আসে।

বুড়ি বলল, মিলিটারি আসে বউ।

তুমি জানলে কী করে মা? কুমুদিনী ঘুরে বুড়ি শাশুড়িকে দ্যাখে। বিস্মিত হয়। তাহলে কি শাশুড়ি বুড়িও ওই স্বপ্নটা দেখেছে? সে বলল, তুমি স্বপ্ন দেখেছ ?

স্বপ্ন, স্বপ্ন কেন?

স্বপ্ন দ্যাখোনি তবে জানলে কেমন করে ?

বুড়ি বলল, কেউ যেন বলে বউ, কে যেন বলে, কালো মানুষ নাকি বলে বউ।

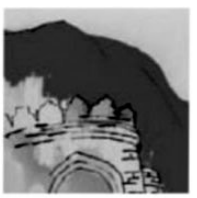

কুমুদিনী কথা বলল না আর। বুড়ির মাথা খারাপ হচ্ছে দিনে দিনে। বয়স তো কম হল না। তাই এসব বলছে। কুমুদিনীর মনে হল বুড়ি তো সমস্ত দিন ঝিমোয়। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে। এখনও বুড়ির ঘুম কাটেনি। সে দ্রুত কাজ করতে থাকে। ব্ল্যাকি উঠল। কিন্তু বুড়ির কেমন মনে হল , বলল, তুমি কোথায় যাও?

ব্ল্যাকি দেখতে পাচ্ছিল মিলিটারি আসছে। এসে গেল প্রায়। সে কুমুদিনীর কাছে ভেসে গিয়ে বলল, লিভ দিজ প্লেস, হাইড, হাইড, হাইড ইওরসেলফ, সিস্টার পলাও, মিলিটারি এসে গেল, শুনতি পাও না?

কে কথা বলে? বুড়ি জিজ্ঞেস করে।

তখন মিটিং হচ্ছিল রাশিমণির ঘরে। ব্ল্যাকি তাড়া দিল, গো, গো,গো টু রাশিমণিজ হাউজ, যা, যা, বউ যা মিটিনে যা।

লঙ্কেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যেতে মিলিটারি পুলিস ঘর ঘর খোঁজ করতে থাকে, কাঁহা হ্যায়, মণি সিং, ললিত হাজং, স্বরূপচাঁদ, লোংকেশ্বর...।

জানতা নেহি স্যার। এক বুড়ো বলল।

বুটপরা পা লাথি মারল তার পেছনে, গর্জন করে উঠল, শুয়ার কি বাচ্চে, গুয়ায় লাঠি ঢুকাই দিব, এই মেয়েছেলে আছে কি না দেখ ভিতরে গিয়া।

আর উপায় নেই, তারা ঢুকে পড়ে দুই কম্পিতা নারীকে খুঁজে পায় ঘরের কোণে। কচি মেয়েটির বয়স বছর চোদ্দো। তাকে আগে ধরে এক সেপাই। তা দেখে মা বলে, উয়ারে ছাড়ো বাপ, মু একাই দিব দুজনারে, কচিডা মরে যাবে বাপ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, দুই নারীকে ধরে দুই পুরুষ শুইয়ে দিল। এই কাজে তারা খুবই পারঙ্গম। মিলিটারিতে শুধু উপরঅলার হুকুম তামিল করতে হয়, উপরঅলার মার খেতে হয়, গালি শুনতে হয়, শুধু এই ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। বিদ্রোহ দমন করতে এর চেয়ে ভালো ওষুধ আর নেই। দুই নারীর একজন সদ্য নারী, চোদ্দো, তাকে নিল বছর পঁয়তাল্লিশের সিপাই, তার মা, বছর তিরিশ-বত্রিশ, তাকে নিল ত্রিশ-বত্রিশই। দুজনকে পাশাপাশি বেআব্রু করে সিপাইরা পজিশন নিল। মাগো মা। মা ও মেয়ে দুজনেই তাদের মাকে ডাকতে লাগল। পারঙ্গম সিপাইরা সময় নিল না বেশি। একাগ্র তীক্ষ্ণ বেয়নেট নিয়ে মা ও মেয়ের উপর চড়াও হল। মা ও মেয়ে ধর্ষিত হতেই থাকে এক সঙ্গে এক ঘরে। মা মেয়ের জন্য কাঁদে। মেয়ের চোখ শুকিয়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে ভীষণ যন্ত্রণায়। দুই পুরুষ দুই নারীকে ধর্ষণে অজ্ঞান করে তৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এসে মিশে গেল মিলিটারি সেপাইয়ের দঙ্গলে। মার্চ করে চলতে লাগল। সময় থাকলে তারা আবার নিত দুজনকে বদলাবদলি করে। মায়ের বদলে মেয়ে, মেয়ের বদলে মা। খোঁচড় নিতু হাজং বলল, লঙ্কেশ্বরের নতুন বউ, সেইডা খুব কচি, সেইডারে নিতি পার।

সেনানায়ক তার পাছায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমহারা লেড়কি নেহি?

না, স্যার, হামার বিবি বাঁজা। নিতু ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, তারে আমি ত্যাগ দিইছি।

এই ঝুট মাত বোলো, কিতনা উমর হ্যায় বিবি আউর লেড়কি কো, ক্যাম্প পর ভেজ দো, ওয়ান নাইট।

হুজুর মা-বাপ, হাম সাচ বলতিছি, যিশু গডের কিরে, ফাদার নট্টন জানে, তিনি আমার মা-বাপ।

তুম কেস্তান হো? সেনা নায়ক জিজ্ঞেস করে।

ইয়েস স্যার। নিতু জবাব দেয়।

গুড, বোলো লোংকেশরকি ঘর কাঁহা?

খ্রিস্টান বলে বেঁচে গেল নিতু। তার মেয়ে বউকে ভগবান যিশু রক্ষা করলেন। খুশি হয়ে সে পথ দেখাতে লাগল, বলল, হুজুর সমুখে গিয়া বাঁশ ঝাড়, তারে বাম দিকে ফেলে ডান দিকার পথের ধারে সুপারি বাগান, বাগানের পিছনে লঙ্কেশ্বরের ভিটা।

তখন ব্ল্যাকি কুমুদিনীর কানে কানে বলল, তুই সমুখের পথ দিয়ে যাসনে।

হায় হায় হায়। সে জাগন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছে। কে যে কী বলছে সকাল থেকে তার ঠিক নেই। ব্ল্যাকি এবার কুমুদিনীর পিছু পিছু যাবে রাশিমণি হাজংয়ের ঘরে। মিটিং শুনবে। বলবে যুবতী মেয়ে-বউরা সাবধান হও। মিলিটারি এবার মেয়েদের উপর ঝাঁপাবে। মিলিটারিরে হুকুম দিয়েছে কালেক্টর ব্যাস্টিন। মিলিটারি হুকুমের দাস। এসব ভাবতে ভাবতে ব্ল্যাকি গাঁদা ফুলের বাগান দেখছিল, হলুদ রঙে মোহিত হচ্ছিল। তখন সুপারি বাগান ভেঙে মিলিটারি ঢুকে পড়ল লঙ্কেশ্বর কুমুদিনীর ভিটেয়। বন্দুক উঁচিয়ে। কাঁহা হ্যায় লোংকেশর, উনকো বুলাও।

কুমুদিনী কী মনে করে হাতে নিয়েছিল কাস্তে। কাস্তে উঁচিয়ে সে বলে উঠল, ঘরে নাই।

ঝুট বলিস কেন, বোল, কাঁহা হ্যায় লোংকেশর?

জানিনে। কুমুদিনী গর্জন করল, তুমরা যাও।

তখন মিলিটারির দুজন ঘরে ঢুকতে গিয়ে দ্যাখে দরজায় বুড়ি বসে আছে। বুড়ি হাতনে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে দরজার সমুখে পৌঁছে গেছে। বুড়িকে লাথি মেরে তারা ভিতরে ঢুকে পড়ল। তছনছ করল। বেরিয়ে এসে গর্জন করল, এই বিবিকে তোল, ক্যাম্পে নিয়ে চ।

ব্ল্যাকি আটকাতে গিয়ে টের পায় সে পারছে না। তার লাথি বাতাসে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আঘাত করছে না কোনও। বুড়ো দানবের পরিমণ্ডল থেকে সরে এসেছে সে। মানে ক্রমশ অন্ধকার মুক্ত হচ্ছে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি তা। সুতরাং সে অনিষ্ট করার শক্তি হারিয়েও হারায়নি একেবারে। সে এক মিলিটারির ভিতরে প্রবেশ করে বুঝল, পারছে না। মিলিটারি গর্জন করেই যাচ্ছে। ব্ল্যাকি টের পায়, তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সে নিজেই হারিয়েছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো হয়েছে। হায় হায় হায়, সে বুড়ো হয়েছে। কিন্তু না। বুড়ো হলেও পারত, কেননা সে ডেমন ব্যাস্টিনের দাস। সে অনিষ্ট করতে পারে। তাই-ই পারত। মিলিটারিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারত ধর্ষণে। কিন্তু সে ধর্ষণকারীকে, অনিষ্টকারীকে নিবৃত্ত করতে পারে না। তার ভিতরে অন্ধকার বাস করে। সে আলোর কথা ভাবতে পারছে এই ঢের। এই ভাবনাও স্বাভাবিক নয়। তার আর একটা মানে হয়। পরে তা বোঝা যাবে। সে ভেসে চলে গেল রাশিমণির ভিটেয়। রাশিমণির বয়স বছর চল্লিশ। সে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী। তেজস্বিনী। রাশিমণির ভিটেয় যে গোপন মিটিং হচ্ছিল সেখানে পুরুষ ভলান্টিয়াররাও ছিল। রাশিমণির ভিটে গাঁয়ের যে প্রান্তে সেদিক দিয়ে মিলিটারি যায়নি। মিলিটারি ঢোকে এক পথে, নিষ্ক্রান্ত হয় অন্য পথে। মিলিটারির অভিযানের কৌশল তাই। রাশিমণি জানে না মিলিটারি ঢুকেছে। ব্ল্যাকি এসে খবর দিল। কে বলল?

ব্ল্যাকি তার কানে কানে আবার বলে দিল, কুমুডিনীর খুব বিপদ, মিলিটারি ধরেছে, উহারে বাঁচাও, সেভ হার, কুমুডিনী ইন ডেঞ্জার।

রাশিমণি কেন, সকলে অবাক। কী বলল? কিন্তু এখন কি বিচারের সময়, যেই বলুক বিপদের কথা বলেছে, খারাপ খবর মিথ্যে হয় না। রাশিমণি বলল, মিলিটারি পুলিস ঢুকেছে, কুমুদিনীর বিপদ হয়েছে।

সত্যি? মিলিটারির কথায় অন্যান্যরা ভয় পেয়ে গেল। মিলিটারি! সে পলায় নাই কেন? লঙ্কেশ্বর কোথায় গেল? ব্ল্যাকি খবর দিল। সে পালিয়েছে। বউ এখেনে মিটিং করতে আসবে বলে ঘরে রহি গিছিল। শাউড়ির ভাত ফুটায়ে আসবে ঠিক ছিল। তো মিলিটারি তাকে ধরে নিয়েছে। কবুতর ধরেছে যেন বিড়ালে। বাঘে হরিণ ধরেছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল রাশিমণি। চলো, মিলিটারি ধরেছে কুমুরে।

কে বলল কথাটা ?

কেউ না কেউ বলেছে, চলো কুমুর বিপদ।

কে বলল কে জানে। সাতজন ছিল ঘরের ভিতর। রাশিমণির আর সময় নেই, মনে হল, বলে উঠল, খুব বিপদ, কুমুদিনী, নোতন বউরে মিলিটারি ধরেছে, বহেরাতলীর সব বাহিরে আসো, পথে নামো, ওগো শুনো বহেরাতলীর মানুষ, সিপাই মিলিটারি ঢুকেছে, ঘরের বাহিরে আসো।

॥ পনেরো ॥

ঘরে ঘরে ডাক পৌঁছে গেল। ব্ল্যাকিও পৌঁছে দিল, রাশিমণিও ডাক দিল। ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এল। পথে নেমে রাশিমণি হাঁক দিল, মিলিটারি ঢুকেছে, যার যা আছে, দা, কুড়ুল, খোন্তা, শাবল, বর্শা, হাতা-খুন্তি, তির-ধনুক নিয়ে বাইরে আসো, পথে নামো, বহেরাতলীতে পুলিস মিলিটারি ঢুকেছে।

কিন্তু খবর পেল কী করে রাশিমণি? সত্যিই কি মিলিটারি পুলিস ঢুকেছে? তাহলে তো ভয়ানক বিপদ। পালাতে হবে। কেউ কেউ বলল, পলাও, পলাও, মিলিটারি ধরলে কিছু করার নেই, গুলি করে মেরে দেবে।

নাই? রাশিমণির দু'চোখ জ্বলছে, কিছু করার নাই, তোমার মেয়েরে যদি ধরত?

বন্দুক নিয়ে এসেছে, কী করবে তুমি? আর একজন বলল।

বনে গিয়া লুকাও, ঘাসের ভিতর লুকাও পুকা মাকড়ের মতোন। রাশিমণি হাঁক দিল, সবু বাহিরা আস, বহেরাতলীর খুব বিপদ।

যারা মিলিটারির ভয়ে পাহাড়ের দিকে পালাবার কথা ভাবছিল, তারা গা ঝাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রাশিমণির ডাক শুনে। তবু ভয় যায়নি। বলল, মিলিটারি ধরা মানে বাঘের মুখে যাওয়া, কিছু করার নেই। তখনই কুয়াশা কেটে রোদের মুখ দেখা গেল। সকলে পথে নেমে আসছিল। তখনই শোনা গেল কুমুদিনীর আর্তনাদ, ও মাগো মা, আমারে নিয়া যায়, বাঁচাও।

কুমুদিনীকে এক সেপাই তার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে শোধ নেবে। রেপ অ্যান্ড মার্ডার, দুইই হবে। ব্যাস্টিন সায়েব খুশি হবে। নতুন বউয়ের আঁচল লুটিয়ে গেছে, বেআব্রু হয়ে গেছে নতুন বউ। তা দেখে রাশিমণি তার নারীবাহিনীকে ডাক দিয়ে ধেয়ে গেল। তাদের সঙ্গে পুরুষ ভলান্টিয়াররাও ছিল। মিলিটারি বন্দুক তাক করে আসছে। তাদের দিকে ছুটছে রাশিমণি। কেউ কেউ আটকাতে চায় তাকে, যাস না বউ, মিলিটারি গুলি করবে।

কুমুদিনীকে নিয়ে যাচ্ছে মিলিটারি। কিন্তু মিলিটারির বিরুদ্ধে কি যাওয়া ঠিক হবে? রাশিমণি গর্জন করছে, 'ময় তিমাত (নারী— হাজং ভাষার শব্দ), তিমাতের ইজ্জত রক্ষা ময় করিব, নয় মরিব, তরা নীতি লয়া বয়্যা থাক।'

হায় হায় হায়। কী বলে রাশিমণি? সবাই তার সঙ্গে ধেয়ে গেল মিলিটারির দিকে। হাতে বাঁশ কাটা দা। রাশিমণি তার নারী বাহিনী নিয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে, ওরে ছেড়ে দাও।

হট, হট, গোলি মার দেঙ্গা।

আমি কয়েছি ছেড়ি দাও।

আরে হট, রেন্ডি আউরত হট, গোলি মার দেঙ্গা। বলে সৈনিক এগতে গেলে রাশিমণি বলল, তোরে আমি পেটে ধরেছিলাম, তোরে ছাড়বনি, ময় তিমাত, তিমাতের ইজ্জত রক্ষা আমার দায়। বলতে বলতে দা চালিয়ে দিল মিলিটারির গলায়। রাশিমণি ঝাঁপিয়ে পড়ল কুমুদিনীকে ধরে রাখা সৈন্যর উপর। কুমুদিনীকে ছিনিয়ে নিল রাশিমণি। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী ছাড়বে কেন? অন্য মিলিটারি গুলি চালাতে আরম্ভ করল। রাশিমণির বুক ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেল। রাশিমণির রক্তাক্ত দেহ ঢলে পড়ল। কিন্তু তাতে দমেনি বহেরাতলীর মানুষ। ব্ল্যাকি অবাক হয়ে দেখছিল দা, কুড়ুল, তির-ধনুক নিয়ে মানুষের যুদ্ধ। আর এক রাস্তা দিয়ে আর এক মিছিল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সশস্ত্র বাহিনীর উপর। গুলি চলল। রাশিমণির পর সুরেন্দ্র হাজং ঢলে পড়ল। লড়াই চলতে লাগল। ধর্ষক দুই সশস্ত্র পুরুষ মরল। বহেরাতলীর রাশিমণি আর সুরেন্দ্র হাজং শহিদ হল সেই যুদ্ধে। কুমুদিনীকে নিয়ে পালিয়েছিল অন্য ক'জন নারী। টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম শহিদ মাতা রাশিমণি।

যুদ্ধ যুদ্ধ, যুদ্ধ হল, সে এক যুদ্ধের দিন ছিল।
রাজায় টঙ্ক দিব না তাই দুজনায় পরান দিল।।
ওই দ্যাখো ভীষণ যুদ্ধ, বহেরাতলী যুদ্ধ দিল।
ডেমন ব্যাস্টিন হুঙ্কার দেয়, ব্ল্যাকি কেন সেথায় ছিল?
চাষার মেয়ের ইজ্জত নাও, ইহা ব্যাস্টিনের হুকুম হল।
সেই ইজ্জত ফিরিয়া এল, মা রাশিমণির পরান গেল।।

তাইই হয়েছিল। ডেমন ব্ল্যাকি দেখল, রাশিমণি ও সুরেন্দ্র হাজংয়ের মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু কুমুদিনীকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে ওরা। সেই দু'জন মরেছে, যারা মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল। তাদের মৃত্যু যেন শোধ নেওয়া। কিন্তু পুলিসের খোঁচড় নিতু হাজং মরা সেপাইয়ের বন্দুক নিয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটছে। ব্ল্যাকি হাসল। নিতুর এবার কী হবে? নিতু বন্দুক ক্যাম্পে নিয়ে যেতে বেদম মার। শালা, শুয়ার কা বাচ্চে, তুই খবর দিয়েছিস, তাই মেয়েছেলেরা অমন দা-কাস্তে-ঝ্যাঁটা নিয়ে রেডি হয়ে ছিল। মেয়েছেলেটাকে আনা গেল না ক্যাম্পে?

মিলিটারি কুমুদিনীকে ক্যাম্পে ঢুকিয়ে ধর্ষণ করতে পারেনি। তার মানে দানবের পরাজয়। ব্ল্যাকি টের পেল দানবের পরাজয়ে তার জয় হয়েছে। বুড়ো ডেমনের ছায়া সরে যাচ্ছে তার উপর থেকে। কিন্তু বুড়ো ব্যাস্টিন, ডেমন ব্যাস্টিন আগুন হয়ে গেল কুমুদিনীর মুক্তির খবরে। তখন ব্ল্যাকি, সান অফ আ বিচ, করছিল কী? সে গর্জন করতে করতে বাতাসে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। ফিরুক ব্ল্যাকি, তাকে দেখে নেবে বুড়ো দানব গ্রাহাম ব্যাস্টিন। ব্যাস্টিন যত টানে, ব্ল্যাকি তত দূরে সরে। ফিরে আয় ব্ল্যাকি। আয় বলছি। নাহলে তোর মহাসর্বোনাশ। আর ডেমন হয়ে থাকবিনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ব্ল্যাকির চিহ্ন নেই আকাশে বাতাসে, কুয়াশায় রাত্রিতে।

ঝুমি জিজ্ঞেস করল, ব্ল্যাকির হল কি?

কী হবে, কিছুই না। বলল রুমি, সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধরে যেমন কুয়াশা খেয়ে নিয়েছিল, তেমনি ব্ল্যাকিও কুয়াশায় ঢুকে গিয়ে বেরুতে পারেনি।

তাই কি হয় দিদি, ব্ল্যাকির ওসবে কিছু হবে না, ব্ল্যাকি গেল কোথায়? ঝুমি বিপরীত মত প্রকাশ করল।

রুমি বলল, বনের কুয়াশা নেমে বুদ্ধু ব্ল্যাকিরে গিলে নিয়েছে।

ঝুমি মাথা নাড়ে, না, তা হবে না, ব্ল্যাকির কাজ শেষ হয় নাই, ব্ল্যাকি বুদ্ধু না।

রুমি বলল, তুই কিছুই বুঝিসনে, ব্ল্যাকিরে শেষ করে দিয়েছিল ডেমন ব্যাস্টিন, কুয়াশা সে-ই টেনে এনেছিল বন-পাহাড় থেকে, ডেমনের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না।

অতীন আর বিপুল ভয় পাচ্ছিলেন। দুই বোন যেভাবে 'হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, না' করে যাচ্ছে, আবার প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ কাণ্ড না হয়ে যায়। কতবার তাদের থামাতে হচ্ছে যে। এবারও তাই অতীন থামালেন, বললেন, পাণ্ডুলিপিতে যা আছে, তাইই হয়েছিল, কাহিনী তো শেষ হয়নি, কী হয়েছিল বলতে দাও।

হ্যাঁ আপনি পড়েন। বলল রুমি, তবে আমি জানি কী হয়েছিল, কুয়াশায় মরণ হয়েছিল।

অতীন বলতে লাগলেন, সেই শীতের দিন দূর সাইবেরিয়ার বুনো হাঁসের দল এদেশের হাওরে-বাওরে এসে নামে। তারা নেমেছিল সুসঙ্গ দুর্গাপুরের কিছু দূরে মস্ত এক হাওরের জলে। বুনো হাঁসের দল জলে খেলছিল। রাশিমণির মৃত্যু আর কুমুদিনীর মুক্তির পর ব্ল্যাকির আর কিছু করার ছিল না। সে ভেসে ভেসে গারো পাহাড়ের দেশ দেখছিল। ডেমনের ডাক শুনতে পাচ্ছিল বটে, কিন্তু তার কাছে তো ফিরবে না। মানুষের অনিষ্ট করে কেটেছে তার জীবন আর মরণ। এখন কীভাবে কাটাবে তা তাকেই ঠিক করে নিতে হবে। অবাক ব্ল্যাকি উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার যে মুক্তি আসন্ন তা টের পাচ্ছিল সে। দানব সরে যাচ্ছে তার জীবন বা মরণ থেকে। সে জনবসতির বাইরে মস্ত এক হাওরের ধারে গিয়ে নামল মাটিতে। হাওর দেখে তার মনে পড়ল এমন এক হ্রদ জলশূন্য করে দিয়েছিল সে ডেমন ব্যাস্টিনের কথায়। মস্ত জলাশয় শুখা হয়ে গিয়েছিল। ড্রাই লেক নাম হয়ে গিয়েছিল সেই হ্রদের। মাছ মেরে গিয়েছিল সব।

ব্ল্যাকির সব মনে পড়ে। কৃতকর্মের জন্য চোখে জল আসে সেই প্রেতাত্মার। প্রেতাত্মার চোখের জল মানে অন্ধকার। জলের ধারে বসে ব্ল্যাকি অন্ধকার মুক্ত হতে থাকে যেন। আগের দিন হলে, ডেমন ব্যাস্টিনের কাছে ফিরে যেতেই হতো, ব্যাস্টিন আবার হুকুম করত। হাওরের জল শুকিয়ে হাঁসেদের মেরে ফেলার কথা বলত। এক কুড়িহাঁস যদি মরে ভেসে থাকে, বাকিরা ভয়ে উড়ে যাবে, আর মানুষজন টের পাবে দানবের কত ক্ষমতা। ভয় পাবে অবাধ্য প্রজারা। ডেনম ব্যাস্টিন এই সময় তাকে দিয়ে কী করাত? প্রজাদের বাগানের সব গাছ, ভিটের আগান-বাগান, সাতপুরুষের পুরনো জীয়ন্ত আম, জাম, নিম, অশ্বত্থ, বট এক রাত্তিরে শুকিয়ে দিত, কিংবা ঝড়ে উপড়ে ফেলত, ভয় পেত প্রজারা। কিন্তু ব্ল্যাকি বুঝতে পারছে তার মাথা আর দেহের ভিতরে জমে থাকা অন্ধকার ক্রমশ তরল হয়ে চোখের জলে ফুরিয়ে যাচ্ছে, যেমন ফুরিয়ে যায় রাত্রি। তার মাথার ভিতরে শেষ রাত্রির পাতলা অন্ধকার রয়ে গেছে এখনও। ব্ল্যাকি জানে ডেমন ব্যাস্টিন ধরে আছে গলিত, ক্লেদের মতো অন্ধকার, তা ধরে রাখার জন্য নিয়মিত কৃতকৌশল করে। নিজের ভিতরে হিংসা জাগিয়ে তুলতে কতরকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। ব্ল্যাকিও তা এতদিন ধরে করত, সে জানে, মাথার ভিতরে, দেহের ভিতরে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমিয়ে রেখেই দিতে হয়। নিয়মিত অন্ধকার জমা করতে হয়। কিন্তু এখন ব্ল্যাকি সেই প্রক্রিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। তার ভিতরের অন্ধকার ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। মাথার ভিতরে ঊষার আলো ফুটে উঠছে যেন। দিবালোকে প্রবেশ করতে আর কিছুটা দিন রাত্রি কাটাতে হবে, তা বুঝতে পারছে ব্ল্যাকি। সেই সময়, ব্ল্যাকির অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণের সময়, ক্ষিপ্ত কালেক্টর ব্যাস্টিনের অত্যাচার আবার শুরু হয়েছিল। সেই যে মিলিটারি ফিরে গেল তাদেরই দুই সেনার মৃতদেহ নিয়ে, আর সেই দুই মৃতদেহ ছিল দুই ধর্ষকের যারা মা ও মেয়েকে নিয়েছিল পরপর। ধর্ষক দুই সেনাকর্মীর মৃত্যুই যেন সেনা বাহিনীর পরাজয় সূচিত করেছিল। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত কালেক্টরের হুকুমে আরও বেশি সেনা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল বহেরাতলী আর তার আশপাশের গ্রামগুলিতে। সুরেন্দ্র হাজং আর রাশিমণি হাজঙের বাড়ি ভাঙল। কুমুদিনী, লঙ্কেশ্বরের বাড়ি ভাঙল। যাকে দেখতে পায়, তাকেই তুলে চালান করল। পিটিয়ে পিটিয়ে মানুষকে শেষ করতে লাগল। আতঙ্কে গ্রাম ছাড়া হল কতজন। বুড়ো বুড়ি ছাড়া আর কেউ থাকল না গ্রামে। মিলিটারি আগুন দিল ললিত সরকার হাজঙের ভিটে। কোথায় মণি সিং? তারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হল। নয়নাকান্দি, সানখোলা, কমলপুর, মুন্সিপাড়া, নলগড়া গ্রাম পুড়িয়ে দিল। ময়মনসিংহের ছাপাখানা সব বন্ধ করে দিল কালেক্টর ব্যাস্টিন। তার ঠাকুরদা, ডেমন ব্যাস্টিন যেমন বলতে লাগল, সে তেমন করতে লাগল। সময় বুঝে বাণেশ্বর খবরিয়া আত্মগোপন করল। না করলে উপায় ছিল না। এবার সে তার বিবি হলুদ পঙ্খিকে নিয়েই গারো পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। না হলে সেপাই এসে তার বিবিকে তুলে নিয়ে যেত। ভালো সেপাই না খারাপ সেপাই আসত তা নিয়ে যাদের পরবর্তী কালে হবে মাথাব্যথা, সেই সুবুদ্ধ আর প্রবুদ্ধ ঢুকতে পারেনি সুসঙ্গ দুর্গাপুরে কিংবা নগর ময়মনসিংহতে। বহিরাগতের প্রবেশ নিষেধ। পথে পথে বন্দুকধারী, তারা পথে তাদের আটকেছিল এবং ফিরিয়ে দিয়েছিল। বহিরাগত প্রবেশ করলেই গ্রেপ্তার এবং জেল জরিমানা। সন্দেহ হলে লাঠির ঘা। বাণেশ্বরের কাছে হুকুম গিয়েছিল, সরকারের পক্ষে খবর লিখতে হবে। যেমন হয়েছিল হাতিখেদা বিদ্রোহের সময়। সে সরকারের পক্ষে এবং রাজা জমিদারের পক্ষে না লেখায় সংবাদ এবং সংবাদপত্রের উপর রোষ পড়ল কালেক্টরের। কিন্তু কালেক্টর কত দমন করবে? সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে, ছাপাখানায় তালা ঝুলিয়েও খবর তো বন্ধ করা গেল না। কোথায় কী হচ্ছে, সব লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ছে। সাতপুরুষের খবরিয়া বাণেশ্বর জানে কীভাবে লোকমুখে খবর ছড়াতে হয়। একজন দশজনের জমায়েতে বলবে টঙ্ক আন্দোলনের শহিদ মা রাশিমণি আর সুরেন্দ্র হাজঙের কথা। সেই দশজনের প্রত্যেকে আবার ভিন্ন দশজনকে বলবে শহিদ মা রাশিমণি আর সুরেন্দ্র হাজংয়ের কথা, সেই মহাসংগ্রামের কথা। দশে দশে সব ছড়িয়ে যাবে একশো, হাজারে। আর তা ছড়িয়ে যাচ্ছিলও।

কালেক্টরে টঙ্ক মাগে, রাজায় মাগে ধান্য।
মিলিটারি ধেয়ে আসে, বন্দুকই হল মান্য।
কুমুদিনী নোতন বউ, ক্যাম্পে টানছে তারে।
ময় তিমাত, অয় তিমাত, কে নি যায় ওরে?
ছিনাইয়া নে নোতন বউ, গুলিতে মরে জননী।
কে কহিছে, খবরিয়া, শহিদ মা রাশিমণি।
দানবের দাস বেলাকি, বেলাকি করিল, না হবে।।
না, করিয়া বেলাকি গেল কার ভিটাতে, কে রবে।।
মিলিটারির খবর বেলাকি ...।

ছড়িয়ে যেতে লাগল খবরিয়ার খবর। ছাপাখানায় তালা, কিন্তু খবর ছড়ায় আগুনের মতো। দিকে দিকে ডাক পাঠাও, জোট বাঁধো, তৈরি হও। শহিদ মায়ের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ।

॥ ষোলো ॥

ডেমন ব্যাস্টিন ব্যর্থ হয়েছিল। নিরাশ হয়েছিল আর ভাবছিল,

হায়রে, ব্ল্যাকি থাকতেও কিছুই হল না। কুমুদিনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বিদ্রোহীরা। কোথায় ব্ল্যাকি? ডেমন ব্যাস্টিন যে ব্ল্যাকি ছাড়া অচল। প্রেতাত্মা হয়েও সে জমিদার, তার দাস ব্ল্যাকি, দাস ছাড়া সে কিছুই করতে শেখেনি, জল গড়িয়েও খেতে পারে না। গুরুপদ বলে, ব্ল্যাকির খবর নিশ্চয় জানে বাণেশ্বর। বাণেশ্বরকে সবই জানতে হয়। খবরিয়ার কাছে সব খবরই পৌঁছয়। কিন্তু জানল কী করে , ও গুরুপদ?

গুরুপদ বলে, হুজুর মা-বাপ। হাতজোড় করল গুরুপদ।

হ্যোয়ার ইজ নিউজম্যান, বাণেশ্বর খাবারিয়া, অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ ইয়েলো বার্ড, হলুদ পাংখি?

পলাইছে হুজুর। মাথা নত করল গুরুপদ।

নো, আছে, টুমি বোল, কুঠায় আছে নিউজম্যান।

হুজুর পলাইছে। গুরুপদ হাঁটু মুড়ে বসল কালেক্টর সায়েবের পায়ের কাছে।

সে কী করিয়া ব্ল্যাকির খবর পাইলো? চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করে ব্যাস্টিন সায়েব।

হুজুর আই ডোন নো। গুরুপদ হাত কচলায়।

ইউউউ, বাস্টার্ড, ইউ নো এভরি থিং।

হুজুর মা-বাপ, আমার এত সাহস নাই যে ইসব কথা কহিব। বলতে বলতে ব্যাস্টিন সায়েবের পায়ে পড়ে যায় গুরুপদ, আই ডোন নো স্যার।

ব্যাস্টিন কী বুঝল কে জানে, আপাতত ক্ষমা করে দিল কেরানি গুরুপদকে। চোখ রাঙিয়ে বলে দিল, নিউজম্যান নিউজ পায় কী করে তা খুঁজে বের করো, না পারলে গুরুপদকেই হাজতে ভরে দেবে কালেক্টর।

রুমি শুনতে শুনতে গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ব্ল্যাকিরে নিমক হারাম বলা যায়?

কারু নিমক খাইছিল নাকি ব্ল্যাকি? ঝুমি জিজ্ঞেস করে রাগত স্বরে। ব্ল্যাকির একটা রূপ সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে। আহা কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো, আমিও তো কালো সখী..., কার গান কার গান, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ার হেমন্ত। মেঘ কালো আঁধার কালো..., কালো যদি মন্দ হয় কেশ পাকিলে কান্দো কেন? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এত কালোর খোঁজ রাখে ঝুমি। ব্ল্যাকি যেন বংশী হাতে কৃষ্ণ।

ডেমন কি এমনি হইছিল? রুমি বলল, ডেমন এমনি হওয়া যায়, যে তোরে ডেমন করল, তারে তুই ভুলে গেলি শয়তান!

রুমি ঝুমির কথা এমনি ভেসে গেল। আসল কথা হল বাণেশ্বর কী করে অশরীরী ব্ল্যাকি আর ডেমন ব্যাস্টিনের খবর পেল? বলা যাবে না। খবরের সূত্র খবরিয়ার কাছে আছে। খবরের সূত্র সে বলতে বাধ্য নয়। নাহলে ডেমন ব্যাস্টিন আর ব্ল্যাকির খবর সে ছড়ায় কী করে? তাদের কথা লোকে জানল কী করে? গুরুপদ হাতে পায়ে ধরায় তাকে ছাড় দিয়েছে কালেক্টর। কিন্তু গুরুপদকে চোখে চোখে রেখেছে, তার পিছনে এক খোঁচর লাগিয়ে দিয়েছে সাহেব তার প্রপিতামহর নির্দেশে। বাস্টার্ড ইন্ডিয়ানকে বিশ্বাস করে না ব্লু ব্লাড জন ব্যাস্টিন। তার কাছে খবর এল ব্ল্যাকি, কাফ্রি দাস নাকি হাওরের ধারে বসে দূর পৃথিবী থেকে আসা হাঁসেদের সঙ্গে কথা বলে এখন। এমনটি বলে বেড়াচ্ছে খবরিয়া বাণেশ্বর। সে ব্ল্যাকির কথা জানল কী করে? জানল বলেই না সে খবরিয়া। হাওরে বুনো হাঁসের দল নেমেছে। তারা সাদা, ধূসর ছিট ছিট, বাদামি, সোনালি...কত রকম রং তাদের। সারাদিন তারা কলকল করে। ব্ল্যাকির সঙ্গে কথা বলে, তুমি কে গো, তুমি কোন দেশ থেকে উড়ে এলে?

ব্ল্যাকি বলে, আমার কোনও দেশ নাই, নো কান্ট্রি ফ্রেন্ড।

ফ্রেন্ড তুমি জলে এসো। জলে দাগ কেটে কেটে এক বাদামি রঙের এক বুনো হংসী তাকে ডাক দেয়,

আয়রে বন্ধু জলে আয়, / জলের ভিতর বন্ধু পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্ল্যাকি বলে, জলে আমার ভয় করে বন্ধু, পানি ইজ ডেঞ্জারাস।

সাইবেরিয়ার বাদামি রঙের বুনো হংসী জলে ডুব দেয়। মুখ তোলে। আকাশে তাকায়। নীল আকাশ দেখে চই চই চই চই করে জলে দাগ কেটে কেটে এগিয়ে এসে ডানার জল ঝেড়ে নেয় রূপের ছটা শূন্যে ছড়িয়ে। ডাক দেয়,

জলে ভয় কেনরে বন্ধু, জল আমাদের সই।
সারাটা দিন হাঁসের পাল, জলের ভিতর রই।

বুনো হংসী ডাকে, আয়রে আয় জলে আয়, জলের ভিতর খেলবি আয়।

ব্ল্যাকি বলে, হংসী তুমু মোরে জানো না, কালোর নিকট এসো না, জল ছুঁলে জল শুকায় যাবে, সেই ভয়েতে রই।

হংসী বলে, ভুল কথারে ভুল, রাতের কালো কইরে কই, দিনের আলোয় চই চই চই।

ব্ল্যাকি তো জলে নামেনি কোনওদিন। জলের দেশে তার জন্ম নয়। আর ডেমন ব্যাস্টিনের অধীনে থেকে জলভরা সরোবর শুকিয়ে দেওয়াই ছিল তার কাজ। এই যে সে জলের ধারে বসে আছে, এতক্ষণে জল শুকিয়ে দিয়ে লেকের হাঁসগুলিকে খতম করাই তার কাজ হতো। ডেমন ব্যাস্টিন যা করতে বলত, সে তাই করত। না করলে ব্যাস্টিনের তন্ত্র, ব্যাস্টিনের মন্ত্র তাকে বিপন্ন করে ফেলত। সমস্ত দিন দাস্ত আর বমি করেই যেত সে। প্রেত হয়েও রেহাই ছিল না। আগুনে পোড়াত তাকে ডেমন ব্যাস্টিন। ব্ল্যাকি বলল,আমার ভিতরে এখনও অন্ধকার রয়ে গেছে, হংসী তুমি সরে যাও।

বুনো হংসী বলে, অন্ধকারকে আমরা ভয় পাই নে, অন্ধকারে উড়ে যাই দেশের পরে দেশ।

ব্ল্যাকি বলে, সরে যাও, সরে যাও জলের পঙ্খি, মোর মনের ভিতর অন্ধকার আর হিংসি।

সাদা রঙের এক বুনো হংসী ডানা ঝাপ্টে নিল, জলের ভিতর ডুব দিল, আবার মুখ তুলে বলল, তুমি আমাদের কাছে চলে এসো ছায়াটা, না পাখিটা, জলের পাখি কিংবা স্থলের পাখি, আয়রে আয় জলে আয়।

বুনো হংসীর ডাকে ব্ল্যাকি বলল, এমনি কত জল আমি শুকিয়ে দিয়েছি, শুকায়ে খটখট, জলের জীব মরেছে খাবি খেতে খেতে, হাঁস মরেছে, মাছ মরেছে, শ্যাওলা মরেছে, জলের পোকাও।

বাদামি রঙের ডানা ঝাপটে এক বুনো হংসী বলল, এমনি কত জল আমরা খুঁজে নিয়েছি, জল শুকালে উড়ে যাব, আবার নতুন জলে যাব।

হ্যাঁ, কত হাওর কত বাওর, পুবের দেশে আগের বছর নেমেছিলাম এক হাওরে, জল আর জল, বন্ধু সে এমন জল যে জলের তল দেখা যায়, সে জায়গার নাম শ্রীমঙ্গল, সেখানে এক নদী আছে, নদীর নাম জাদুকাটা, সে জল শুকায় তেমন কারও সাধ্য নাই।

ব্ল্যাকি বলল, আমি জলে নামলে জল শুকাবে হংসী।

হংসী বলল, জলে এসো প্রিয়, ওগো প্রিয়, জল আমাদের ভূমি, এই জন্মে হংস হলে তুমি।

আমার ভিতরে অন্ধকার, জল বিষিয়ে যাবে। ব্ল্যাকি বলল।

ধুয়ে দেব জলে। বলল বুনো হংসী,

আয়রে আয় জলে আয়, দুধ মাখা ভাত কাগে খায়।

হি হি করে হাসল ব্ল্যাকি। এমন কথা শোনেনি কতকাল। সেই যখন ছোট ছিল, মায়ের কোলে ছিল সে, মা বলত এমনি করে,

আয়রে মেঘ ছেয়ে আয়।/ আমার পুতে দুদু খায়।।
আয়রে বাতাস, বয়ে আয়।/ পুতের ঘুম চোখে বায়।।
আমার সোনা চাঁদের কণা/ চাঁদ উঠেছে ওই।
মরু ভেঙে পুতের বাপে/ ঘরে ফেরে কই?

কতদিন বাদে ব্ল্যাকির এসব মনে পড়ে গেল। বাকি অন্ধকার চোখের জলের সঙ্গে নেমে গেল। সে ঝুপ করে জলে নেমেই হাঁস হয়ে গেল। কালো হাঁস হয়ে মিশে গেল অন্য হাঁসেদের ভিতর। তার দানব জন্ম শেষ হল। সে জানত না, তার ভিতরের অন্ধকার আর ক্লেদ ফুরিয়ে গেছে আগেই। কিন্তু হাঁস হয়ে বহেরাতলী, বিরিসিরির কথা ভুলল না।

ব্ল্যাকি ছিল হুকুম-দাস।/ ব্ল্যাকি হল বুনো হাঁস।।

ব্ল্যাকি বুনো হাঁসের পালে মিশে গেছে, তাতে ডেমন ব্যাস্টিনের ক্রোধ আরও বেড়ে গেছে। প্রেস তো বন্ধ হল। বাণেশ্বর খবরিয়ার তালাবন্ধ বাড়ি ভাঙচুর করল পুলিস। খবরিয়া আত্মগোপন করে বসে ছিল না। তার কাজ সে করে যেতে লাগল। ক্ষিপ্ত কালেক্টরের অত অত্যাচারও মানুষকে দমাতে পারেনি। সে ছিল অদ্ভুত সময়। মানুষ সব জেনে যাচ্ছিল আগে আগে। ফলে মানুষকে ধরতে পারছিল না পুলিস মিলিটারি। খবর দিচ্ছিল বুনো হাঁস। সে রাতে উড়াল দিচ্ছিল। লোকের কানে কানে সব বলে যাচ্ছিল। কালেক্টরের সব অত্যাচার ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল। কালেক্টর বুঝছিল, সেই খবরিয়া বাণেশ্বরই ছড়িয়েছে সব।

কিন্তু ডেমন ব্যাস্টিন করল কী? দাসের জন্মান্তর হয়েছে। ব্ল্যাকি বুনো হাঁস হয়ে হাঁসের ভিতর মিশে গেছে। বুড়ো ডেমনের নিজে কিছু করার অভ্যাস ছিল না। যা করেছে ব্ল্যাকিকে দিয়ে করেছে। ব্ল্যাকি ছাড়া সে অচল। অচল বটে কিন্তু তার হিংসা তো রয়েছে। তার অন্ধকার তো রয়েছে। প্রতিরাতের অন্ধকার কিছুটা করে আহরণ করে সে। ক্রুদ্ধ ডেমন ব্যাস্টিন আবার চেষ্টা করবে। হিংসার শেষ হয় না। শেষ নেই। হিংসায় হিংসা বাড়ে। ব্যাস্টিন তার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাজং চাষিদের উপর।

কেরানি গুরুপদ শুনতে পাচ্ছিল সুসঙ্গ দুর্গাপুর আর গারো পাহাড়ে যা ঘটছে তা কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না সরকার। প্রেসে তালা দিয়েও না। কালেক্টরকে থামানো যাচ্ছিল না। স্লেভ স্লেভের মতো থাকবে। স্বাধীনতার আগে বাস্টার্ড ইন্ডিয়ানদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ব্রিটিশ সিংহের গর্জন আছে। আর আছে দাঁত। কালেক্টর ব্যাস্টিন তার হিংস্রতা ক্রমশ তীব্র করে তুলছিল। সরকারি বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছিল। ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল। কৃষক রমণীদের উপর অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। বগাঝড়া গ্রামের কৃষক বধূ ব্রজমণি ধর্ষিতা হল। আর মেয়েরা লাঞ্ছিত হল। সেই খবর নিয়ে বুনো হাঁস কতদূর উড়ে যায়। খবর হল, লুঠতরাজ, ধর্ষণ, অত্যাচার চলছে। কৃষক সভার ঘর ভেঙেছে সরকারি হানাদারের দল। নলিতাবাড়ি থানার কালীনগর ,ভটপুর, কান্দুলী গ্রাম পুড়িয়ে দিল ব্যাস্টিন বাহিনী। রাজবংশী কৃষকদের ধরে ক্যাম্পে এনে অত্যাচার চলতে লাগল। বুনো হাঁস খবর নিয়ে উড়ে যায়। কৃষক সভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি ডাঃ সুবল বেরাকে পাঠায় সরেজমিন তদন্তে। ব্যাস্টিন তাকে ঢুকতেই দেয় না সুসঙ্গ দুর্গাপুরে। পথেই গ্রেপ্তার করে ময়মনসিংহ পাঠিয়ে দেয়। রেডক্রশকেও ঢুকতে দেয় না কালেক্টর। বুনো হাঁস খবর নিয়ে উড়তে লাগল। কৃষক আন্দোলনে এমন হয়ে থাকে। আগেও হয়েছে, পরেও হয়ে থাকবে। তখন কলকাতার আর এক প্রতিনিধি দল রওনা হন কী হচ্ছে তা দেখতে। কে কে ছিলেন সেই দলে? কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, প্রভাত দাশগুপ্ত। তাঁদের থানায় আটক করে রেখে দেয় ব্যাস্টিন বাহিনী। জ্যোতি বসুকে বহিষ্কার করা হল ময়মনসিংহ থেকে। সকলকেই ফিরিয়ে দেয় কালেক্টর। প্রশাসন কৃষক দমন এই ভাবেই করে থাকে। আগেও যা পরেও তা। হাজং জাতি মরছে, মারছে তাকে কালেক্টর ব্যাস্টিন যে কি না ছিল আদিবাসী বিশেষজ্ঞ। শোনা যায় তা। মণি সিং আর সব নেতা নেত্রীর নামে তখন হুলিয়া। পুলিস তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হাজং জাতি দমে না,

মণি সিং ডাক দিইছে।/ টঙ্ক দিতা না কইছে।।
ব্যাস্টিন এক এক ব্যাঘ্র হল।/ চাষার হাতে জব্দ হল।

কিন্তু গারো পাহাড়ের কোলে হচ্ছে কি তখন? দেশ ছেড়ে চলে যাবে ব্রিটিশ। ব্যাস্টিন সায়েব পূর্ণ উদ্যমে গারো পাহাড় অঞ্চলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজং চাষিদের শেষ করে দিতে নেমে পড়েছিল। হায়, সেই বুনো হাঁস ছিল সাক্ষী। তার চোখের সামনে সব ঘটছিল। সে তখন কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায় রাতের আকাশে।

॥ সতেরো ॥

বুনো হাঁসের কিছুই করার ছিল না। সে আর ডেমন নেই, হাঁস হয়ে গেছে। হাঁসের ক্ষমতা নেই যে প্রতিরোধ করে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ছে। তা দেখছে সে। দেখে উড়াল দিচ্ছে দূর দূরান্তে। বুনো হাঁস আকাশে দাগ রেখে উড়াল দেয়। আবার সেই দাগ ধরে ফিরে আসে। রাতভর উড়ে যায় এক শহর থেকে অন্য শহরে। ঢাকা, খুলনা, বসিরহাট, বারাসত, কলকাতা। শহর সে অনেক দেখেছে। সেই শহরের পাখিদের বলে যায় কী হয়েছে গারো পাহাড়ের কোলে, হাজং জাতির গ্রামে। জলে বিষ দিয়ে যেমন জলের প্রাণী মারে, তাদের যাওয়ার আর জায়গা থাকে না, তেমনি করে হাজং গ্রাম শেষ করছে কালেক্টর ব্যাস্টিন। মিলিটারি দিয়ে ঘিরে গ্রামে আগুন দিচ্ছে। বাড়ি ঘিরে রেখে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। খামারের ধান পুড়িয়ে দিচ্ছে। নিঃস্ব করে দিচ্ছে মানুষজনকে। মানুষকে গ্রাম ছাড়তে দিচ্ছে না, আবার বাইরের মানুষকে পোড়া গ্রামে, জ্বলন্ত গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না। গেরস্ত হয়তো হাটে বা গঞ্জে গিয়েছিল কেনাকাটা করতে, কিংবা কুটুমবাড়ি কুটুম্বিতা করতে, কুটুমবাড়ি বসেই শুনল সেনা ঘিরে নিয়েছে তাদের গাঁ। ঢোল বাজছে,

অমুক গাঁয়ে যেওনি,/ পুড়ছে গাঁ, হাজংজাতির ধরণী।

গাঁয়ের ধারে যাওয়া যাবে না, গেলেই সশস্ত্র পুলিস ধরে চালান করে দেবে সদর ময়মনসিংহ। কত লোক যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ভয়ে গাঁয়ের দিকে যাচ্ছে না, তার হিসেব নেই। যারা গাঁয়ে আছে, তারা বেরতে পারছে না। তাদের ধানের গোলা পুড়েছে, খামার পুড়েছে, না খেয়ে আছে সব। সরকার বলছে, লঙ্গরখানা খুলবে, কবে খুলবে, কেউ জানে না। সরকার এমন পারে। শাসক এমন পারে এবং এমন করে। শাসক জানে মানুষের মাথা নত করিয়ে বশে আনাই শাসকের প্রধান কাজ। আতঙ্কিত না করতে পারলে মানুষ বশীভূত হয় না। ব্যাস্টিন গারো পাহাড় অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, গারো পাহাড়ের কোলের মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল চারদিক থেকে। অবরুদ্ধ গ্রামের খবর নিয়ে নেত্রী কলাবতী হাজং গিয়েছিল অবিভক্ত ভারতের কৃষকসভার শেষ সম্মেলনে, মুক্তাগাছায়। সম্মেলনে সব প্রকাশ হয়ে গেল।

গারো পাহাড়ে কী হচ্ছে তা চাপা দিয়েও চাপতে পারছিল না ব্যাস্টিন আর ব্রিটিশ প্রশাসন। বুনো হাঁস খবর নিয়ে উড়ছিল। খবরিয়া খবর ছড়াচ্ছিল। কলকাতা থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী বড় চিঠি দিলেন গণপরিষদের আর এক সদস্য কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুকে। সোমনাথ লাহিড়ী লিখলেন,

'কালেক্টর ব্যাস্টিনের অভিযানের পিছনে এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। ভারতকে আরও ভাগ করে দেওয়া। বাংলা আসাম সীমান্তের আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য এক পৃথক রাষ্ট্র গড়ে দেওয়া। ব্যাস্টিন যে ময়মনসিংহ জেলার কালেক্টর হয়ে ১৯৪৬-এ নিযুক্ত হন, তার কারণ আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নতুন রাষ্ট্র পত্তনের পথ সুগম করা। হাজংদের ভিতর মিশনারিরা প্রচার করছে, তারা যেন সব রাজনৈতিক দলকে পরিত্যাগ করে প্রভু যিশুর অনুগামী হয়। সায়েব ব্যাস্টিন তাঁরই প্রতিনিধি। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের জমিদার, ভূস্বামীরা ব্যাস্টিনকে মদত দিচ্ছে এবং গণ অভ্যুত্থানের মিথ্যা কথা রটিয়ে দিচ্ছে। গণ সন্ত্রাসের কাহিনী ছড়াচ্ছে। আত্মরক্ষার জন্য যা করতে হয় হাজংরা তাই করছে। হাজং জাতি শান্তি প্রিয়। তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে ব্যাস্টিন প্রেরিত সেনা বাহিনী। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যার ফলে বিপুল সেনা বাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে বর্বরতা চলতে পারে না। কর্তৃপক্ষ বে-আইনি ভাবে একশোটি বাড়ি ধ্বংস করেছে, কুড়িজনের বেশি নারীর শ্লীলতাহানি করেছে। চারজন নারী-পুরুষকে হত্যা করেছে।'

অতীন বলছেন, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এই সব ইতিহাস এবং কথাকাহিনী রয়েছে। অতীন কিছুটা সংগ্রহ করেছেন, অনেকটা তার কাছে যেন নিজে নিজে চলে এসেছে। নিজে নিজে চলে এসেছে মানে, অতীনের অজান্তে তাঁর হাতে যেভাবে এসেছে এই পাণ্ডুলিপি, তেমনি তাঁর অজান্তে চলে এসেছে কত কথা-কাহিনী। যে কাহিনী ছিল অশ্রুত, সেই কাহিনী। যে কাহিনী ছিল লুক্কায়িত, সেই কাহিনী। কালেক্টর ব্যাস্টিনের ঠাকুরদা, কিংবা তাঁর বাবা ডেমন ব্যাস্টিন আর সেই কাফ্রি দাস, ব্ল্যাকির কথা অতীনের পাণ্ডুলিপিতে কীভাবে এল তা অতীনের অজানা। ছিল কি আগে থেকে? তাহলে তো কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা হয় না। টঙ্ক আন্দোলন না এলে কালেক্টর ব্যাস্টিন আসে না, কালেক্টর না এলে তার পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ ডেমন আসে না। ১৯৪৬ এর নভেম্বরে ব্যাস্টিন ময়মনসিংহর কালেক্টরের পদে যোগদান করেন। টঙ্ক আন্দোলন কৃষক সভার আন্দোলন ছিল, এবং কৃষক সভা কমিউনিস্ট পার্টির একটি সংগঠন হওয়ায় এই আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ায়নি স্থানীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ। কংগ্রেস এই আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেনি। কিন্তু স্থানীয় ভূস্বামীরা তো বিপক্ষেই ছিল। এবং তাঁরা কেউ কংগ্রেস করতেন, কেউ মুসলিম লিগ করতেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এই আন্দোলন সার্থক হলে, ভূসম্পত্তিতে তাঁদের অধিকার খর্ব হবে। যাঁরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছিলেন পাকিস্তানের জন্ম আসন্ন হওয়ায়, তাঁরা ভাবছিলেন এপারে তাঁদের প্রতিনিধি থাকল। ওপারে বসেই লাভ করবেন জমির আয়। আবার এমন হতে পারে, খণ্ডিত দেশ আবার জুড়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। কিন্তু এসব তো পরের কথা, ১৯৪৬ ছিল গারো পাহাড়ের রক্তস্নাত সময়। একদিকে ব্যাস্টিনের সেনা বাহিনী আর সশস্ত্র পুলিসের অত্যাচার, অন্যদিকে রিলিফ দিতে আসা নেতাদের উপদেশ, কৃষক সভা ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদানের উপদেশ। কিন্তু মণি সিং, ললিত সরকারের মতো ডাক দিতে তো কেউ পারে না যে তারা মণি সিংয়ের ছায়া ত্যাগ করে অন্য দলের ছায়ায় যাবে। টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনই শেষ অবধি তেভাগা আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়ে যায়। নেত্রকোনা মহকুমায় টঙ্ক বিরোধী আন্দোলন এবং তেভাগার দাবি একসঙ্গে ওঠে। এই সময় অবিভক্ত ভারতের কৃষক সভার শেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মুক্তাগাছায়। সেখানে যা শুনেছিল বুনো হাঁস, সেই কথাই অতীনের পাণ্ডুলিপিতে আছে। বুনো হাঁস শুনতে শুনতে টের পেয়েছিল ডেমন ব্যাস্টিন আবার শক্তি সঞ্চয় করেছে। মানুষের ভিতর দানব না ঢুকলে মানুষ এভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করতে পারে না। টঙ্ক নেত্রী কলাবতী হাজং বলতে শুরু করেছিল ব্যাস্টিন বাহিনী অত্যাচারের কথা। অবরুদ্ধ গ্রামে তার লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে করতে না করতে পারার কথা। যে মেয়েদের সশস্ত্র পুলিস ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাহিনী। সেই কাহিনী কলাবতীর হতে পারে না, হতেও পারে। কলাবতী হাজং ছিল গারো পাহাড়ের নারী, সব নারীদের প্রতিনিধি। তার বিবরণ ছিল ভয়ঙ্কর সত্য। কলাবতী বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, বলে উঠেছিল, সে কথা ময় আর কইতা পারব না, তরা কেউ কইয়া দে...।

কইয়া দে কইয়া দে। ক্যাম্পে কেমন নিয়ে গিয়েছিল দশ বছরের কুঁড়িকে। ফুল ছিড়েছে কত। হায়, মরেছে তারা কত। লাশ সরিয়ে দিয়ে বলেছে, তারা কিছু জানে না।

কে কইবে? বাণেশ্বর খবরিয়া আত্মগোপন করেছে। কে বলবে কলাবতী হাজং যা বলতে পারেনি, আমি তাই বলছি, কী হয়েছে গারো পাহাড়ের দেশে। বুনো হাঁস বোঝে সেই গ্রাহাম ভিলের বুড়ো ডেমন ব্যাস্টিন এই করছে। সে কলাবতীর কথা নিয়ে কাঁদতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁদতে ওড়ে আকাশে। বুনো হাঁসের চোখের জল গারো পাহাড়ের গায়ে এসে ঝরে। মাটিতে ঝরে। বনে ঝরে। সিমসাং নদীতে ঝরে।

ওরে ও সিমসাং নদী, বহেরাতলী, বিরিসিরি।
মাঠ-পাথার, বন-জঙ্গল, মেঘবরণ গিরি।।
কলাবতী, ব্রজমণি, কত নারীর কথা।
অশ্রু নদী, অশ্রু হাওর, কত নারীর ব্যথা।।
ময় কইতা না পারি, ময় না পারি, তরা কইয়া দে।
তবু দিব না, ধান দিব না, এইডা শুনায় দে।।

বুনো হাঁস উড়ে যায়, ফিরে আসে। হাওরের হংস আর হংসীকে বলে, কী হয়েছে এই দেশে। তোমরা সব আমার কথা শোনো, আমার সঙ্গে এসো, উড়ে উড়ে বলে যাই, গারো পাহাড়ের দেশে কী হয়েছে। গারো পাহাড়ের অবরুদ্ধ দেশে কী করছে সশস্ত্র পুলিস আর সেনাবাহিনী। যে কথা কেউ জানে না, সে কথা ছড়িয়ে দাও। ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। কুয়াশাভরা দিনের অবসান হয়েছে। সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হল। বেলা বড় হচ্ছে। সেই আগের মতো গ্যাঙের বাঁকে মুছে যাওয়া নাওয়ের মতো বেলা ফুরিয়ে যায় না। বুনো হাঁসের দল বলে, আমরা এবার ফিরে যাব নতুন বন্ধু, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।

বুনো হাঁস, কালো হাঁস, সেই গত জন্মের ব্ল্যাকি, কাফ্রি দাস চুপ হয়ে গেল। সে চলে যাবে এই দেশ ছেড়ে? হাঁসেদের সঙ্গে উড়তে উড়তে সেই উত্তরে, আরও উত্তরে। সেখানে কত সরোবর, কত পাহাড়, আকাশ কত নীল। কিন্তু ব্ল্যাকির যে গারো পাহাড়ের কোল ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না। ব্যাস্টিন দানবের অত্যাচারের কথা কে বলে বেড়াবে দূরের শহরে? বলতেই হবে অবরুদ্ধ গ্রাম-দেশের কথা। কিন্তু বারবার ডাক দেয় সেই বুনো হংসী, বলে, জল পাবে না এরপর, ভয়ানক গ্রীষ্ম নেমে আসবে, তুমি যে শীতের দেশের হাঁস হয়ে জন্মেছ পঙ্খি।

বুনো হাঁস উড়ল। দূর আকাশ দিয়ে বুনো হাঁসের দল উড়েই চলে উড়েই চলে। রাত যায়, দিন যায় তারা উড়ে চলে। ব্ল্যাকি এখন আর ব্ল্যাকি নয়, বুনো হাঁস উড়ে চলে অশ্রুপাত করতে করতে। দেশ স্বাধীন হবে কদিন পরেই। কিন্তু তা অনেক মৃত্যু, হত্যা, দাঙ্গা আর অনেক অশ্রুপাতের ভিতর দিয়ে। সেই অশ্রুধারা বয়ে গেছে সিমসাং নদীর ভিতর দিয়ে। সেই জলে বুনো হাঁসের চোখের জল মিশে গিয়েছে, তাই বলে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মানুষ। বুনো হাঁস আর দানব থেকে হাঁস-জন্ম নেওয়া ব্ল্যাকির কথা বলে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মানুষ, সিমসাং আর কংস নদীর তীরের মানুষ।

সিমসাং নদী জানে/ কত অশ্রু এল।
সিমসাং নদী জানে/ হংস কোথায় গেল।।

হুজুর কী হল? গুরুপদ জিজ্ঞেস করেছিল ব্যাস্টিন সায়েবকে।

কী হবে রে গুরুপডা, সব পুড়াইয়া ছারখার। কালেক্টর হুঙ্কার দিয়ে বলেছে।

হুজুর স্বাধীনতা কেমন হবে, হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের ময় কোথা যাব? গুরুপদ বলে।

কালেক্টর ব্যাস্টিন তার পিছনে বুটপরা পায়ে লাথি কষিয়ে বলল, ডেমন সিনিয়র ব্যাস্টিনকে রেখে চলে যাব ইংল্যান্ড, ডেমন তুমার দেশ শেষ করে ডিবে গুরুপডা, ডেমন শাসন করবে দেশ, ছিড়ে দুই ভাগ তো করে দিল মায় গ্র্যান্ড পা ডেমন ব্যাস্টিন, অল মাইটি, না হলে রায়ট আর পার্টিশন হয়? আবার ছিড়বে, আবার, ছিড়বে, কলহ লাগায়ে রাখিবে পরস্পরে, ইন্ডিয়া পাকিস্তান কেহ ভালো থাকিবে না, ইহার পরে কী হয়, বুঝিবে সান অফ আ বিচ!

অতীন থামলে কাঁদতে কাঁদতে ঝুমি জিজ্ঞেস করেছিল, এই কথা সব সত্যি?

রুমি বলেছিল, সেই দুইজন আসে নাই, এইসব দেখতে, তারা যে সব দেখেই মজা পায়।

সুবুদ্ধ প্রবুদ্ধ?

হ্যাঁ, তারা? রুমি জিজ্ঞেস করেছিল।

পাণ্ডুলিপিতে লেখা নেই। অতীন বলেছিলেন।

তাদের কথা তো শেষ হল না। বলল ঝুমি।

কাহিনীও তো শেষ হয়নি। বললেন অতীন।

তাদের জন্য ফের পিঠা করব আমি। বলল ঝুমি।

রুমি বলল, আমি সেই পিঠায় লবণ ঢেলে দিব।

এখানেই কি শেষ হবে ময়মনশাহী উপাখ্যান? বিপুল জিজ্ঞেস করেছিল অতীন সরকারকে। তাকে তো পিতৃভূমি দেখে এবার ফিরতে হবে নিজের দেশে। তার যাওয়ার সময় হয়েছে।

অতীন বললেন, এ কাহিনীর কি শেষ আছে?

জানি, টঙ্কের পর তেভাগা, কৃষকের অধিকার না এলে কৃষক কেন থামবে?

অতীন বললেন, রাজার বাড়ির কেউ থাকল না, তাঁরা ওপারে চলে গেলেন, কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, কিন্তু তাঁদের জমি পড়ে থাকল। থাকল সব নায়েব গোমস্তার হাতে। তারা বলেছিল, ওপারে গিয়ে টঙ্কের টাকা দিয়ে আসবে। কথার কথা। হয় নাকি তা? রাজার বাড়ির কেউ যদি ফিরে আসে, তবে পাবে। সাতশো বছরে রাজত্বের সব রেখে রাজার পরিবার পরিজন, সমস্ত হিন্দু জমিদার, তালুকদার পার হয়ে ভারতে চলে গেল। মুসলমান জমিদার থাকল। তাদের কেউ কেউ হিন্দু-জমিদারি কিনে নিল, কেউ কেউ জমি দখল করে নিল। কোথাও গোমস্তা, নায়েব মালিক হয়ে গেল। চাষারা যে জমির মালিক হবে তা হল না। তারা টঙ্ক ছাড়বে কেন? মুসলমান ভূম্যধিকারী যারা ছিল এই গারো পাহাড়ের দেশে, এই হাওর-বাওড়ের দেশে তারা চায় টঙ্ক বলবৎ থাকুক। কিন্তু চাষারা চায় না। চাষারা চায় না জমিদারি থাকুক। তখন চাষারা প্রতিরোধে নেমেছে, কেউ যেন ভয় করে টঙ্কের ধান বাবু বাড়িতে না নিয়ে যায়। এ তো নতুন কিছু না। কুয়াশা মিলিয়ে গেছে। আবার কুয়াশা ফিরেও এসেছে। বাতাসে বুনো হাঁসের ডানার শব্দ। হাঁস নেমেছে হাওরে। বুনো হাঁসেরাই এই সব কথা নিয়ে ফিরে আসে বছর বছর। পাণ্ডুলিপিতে গারো পাহাড়ের কথা লিখে যায়। বন্য হংসীর লিখন এই উপাখ্যান।

আগামীকাল তারা ফিরবে। অতীন কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিপুলের ঘুম এল না। ঘরের বাইরে যায় সে। আজ এক বিন্দুও কুয়াশা নেই। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। পৌষ পূর্ণিমা নাকি? সুসঙ্গ দুর্গাপুরের সমস্ত কিছুই দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া নগর ফিরে এসেছে। হারিয়ে যাওয়া মানুষও ফিরে আসবে এই চাঁদনি রাতে। প্রবুদ্ধ, সুবুদ্ধ। অনেক রাতে বিপুল ঘরে ঢোকে। মৃদু ঘুম-বাতির আলোয় সে দেখল টেবিলের উপর লাল খেরোয় বাঁধা পাণ্ডুলিপি। মোমেনশাহি উপাখ্যান। বিপুল তার গায়ে হাত রেখেছে। খুব আস্তে আস্তে সুতোর গিঁট খুলল। অতীন ঘুমিয়ে। কী কৌতূহলে যে পাণ্ডুলিপি নিয়ে সে ঘরের বাইরে এল। ঘরে আলো জ্বালালে অতীনের ঘুম ভেঙে যেত তাই বাইরে আসা। চাঁদের আলোয় দেখবে কয়েক পাতা। বিপুল খুলতেই দেখতে পায় চন্দ্রালোকিত নির্মল আকাশে বুনো হাঁসের উড়াল। বিপুল দেখতে পায় হাওরে চাঁদের আলোয় বুনো হাঁসের জল-খেলা। বিপুল দেখতে পায় গারো পাহাড়, বনভূমি, কুয়াশাঘেরা দুর্গ। বিপুল দেখতে পায় সিমসাং নদী। নদীর ভিতরে সওদাগরের নৌকো। অক্ষর কই? আছে কত রঙের চিত্রমালা। বিপুল একবার আকাশে তাকায়, একবার পাণ্ডুলিপির চিত্ররূপে। রং আর ছবিতে। এইভাবে মোমেনশাহি উপাখ্যান আপাতত সম্পূর্ণ হয়। অথবা আরও কিছু বাকি থেকে যায় তার।

(তারকা চিহ্নিত শ্লোক ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে নেওয়া। বাকি সব লেখকের।)

সমাপ্ত